KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীরা চৌধুরী
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫০/৫ ৫০/৭ ৫০/৮ ৫০/১০	Year of Publication ভাদ্র ১৩৯৬ // Sep 1989 কার্তিক ১৩৯৬ // Nov 1989 অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ // Dec 1989 মাঘ ১৩৯৬ // Feb 1990
	Condition : Brittle Good
Editor : আব্দুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা সেপটেম্বর ১৯৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দর্শনভাবনার স্বরূপ সন্ধান করেছেন অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃতকে আর্যভাষাসমূহের জননী বলাটা অবৈজ্ঞানিক, অনেকখানি এই সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীল সেনগুপ্তের সন্দর্ভ "বাঙলা-সংস্কৃতের বন্ধন প্রসঙ্গে"।

আধুনিক বাঙলা কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহারপ্রণালী বিশ্লেষণ করেছেন সুজিৎ ঘোষ।

কলকাতা ঃ তিনশো বছর উপলক্ষে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের বহু বাঙলা উপন্যাসের অস্থিমজ্জায় নগর কলকাতার ক্রম-অনুপ্রবেশ নিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের কৌতূহলোদ্দীপক নিবন্ধ "অস্তিত্বে কলকাতা/বাঙলা উপন্যাস"।

আজহারউদ্দিন খানের গ্রন্থসমালোচনাভিত্তিক নিবন্ধ "মুসলিম জনসমাজ ও বাংলাদেশ"।

"ভাষাবিজ্ঞানীর এ কোন্ শোচনীয় পরিণতি!" মৃণাল নাথের এই সমালোচনার জবাবে হুমায়ুন আজাদের পত্র।

গোরবাচভ আদৌ মার্কসবাদী কিনা, এ সম্পর্কে তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন মিহির মিশ্র।

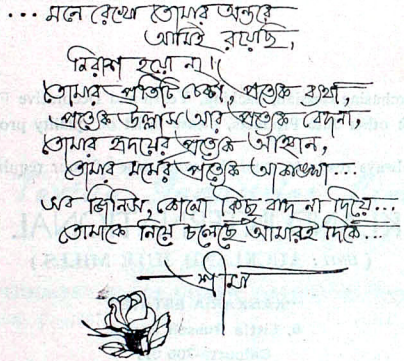

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...
— শ্রীমা

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ৫
সেপটেমবর ১৯৮৯
ভাদ্র ১৩৯৬

দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৮১
আধুনিক বাঙলা কবিতায় চিত্রকল্প সুজিৎ ঘোষ ৩৯৭
অস্তিত্বে কলকাতা : বাঙলা উপন্যাস অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৪১৪
বাঙলা-সংস্কৃতের বন্ধন প্রসঙ্গে সুনীল সেনগুপ্ত ৪৪০

ধারাবাহিকতা সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৩৯৩
তৃষিত আকুল আঁখি পরিমল চক্রবর্তী ৩৯৪
নিশিপালন রফিক উল ইসলাম ৩৯৫
পাপপুণ্য-২ কামাল হোসেন ৩৯৬

ক্ষতিপূরণ মতি মুখোপাধ্যায় ৪০৪

বিতর্ক ৪৩২
হুমায়ুন আজাদ, মিহির মিশ্র

গ্রন্থসমালোচনা ৪৫২
রণেন্দ্রনাথ দেব, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

স্মরণে ৪৫৯
মণীন্দ্রকুমার ঘোষ মৃণাল নাথ / সুধীর সেন

মতামত ৪৬২
শামসুল আলম সাঈদ, হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম,
মোঃ সানাউল্লাহ্, এম. তন্‌বীর, মাসুহুজ্জামান

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

॥ কে পি বাগচীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই ॥

West Bengal Landscapes : A Travel Diary *by* Arun Ghosh — Rs. 200.00

Sharecropping and Sharecroppers' Struggles in Bengal : 1930-1950 *by* Adrienne Cooper — Rs. 225.00

Dissent and Consensus : Social Protest in Pre-Industrial Societies *edited by* Rajat Kanta Ray and ors. — Rs. 180.00

Bengal Land Tenure : The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century *by* Sirajul Islam — Rs. 80.00

Labour Movement in Tamilnadu : 1918-1933 *by* C. S. Krishna — Rs. 90.00

May Day and Eight Hours' Struggle in India *by* Sukomal Sen — Rs. 120.00

History of English Press in Bengal : 1780 to 1857 *by* Mrinal Kanti Chanda — Rs. 168.00

Marx and His Legacy : A Centennial Appraisal *edited by* Deb Kumar Banerjee — Rs. 90.00

Economic Elite and Public Policy *by* Sandhyasree Pathania — Rs. 100.00

Tribal Polities and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North-Eatern India *edited by* Surajit Sinha — Rs. 130.00

বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস —হিতেশরঞ্জন সান্যাল — Rs. 75.00

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতা —এ. আর. দেশাই — Rs. 40.00

ভারত ইতিহাসে নারী —পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ — Rs. 40.00

অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য —মলয় বসু — Rs. 50.00

প্রাক্ পলাশী বাংলা —সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় — Rs. 25.00

বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা —গীতা মুখোপাধ্যায় — Rs. 30.00

আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ —বিপান চন্দ্র — Rs. 70.00

মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি —সতীশ চন্দ্র — Rs. 60.00

মুঘল ভারতে কৃষিব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭) —ইরফান হবিব — Rs. 75.00

মুক্ত নিকারাগুয়া —মানব মিত্র — Rs. 20.00

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ —সুধীর চক্রবর্তী — Rs. 40.00

মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — Rs. 40.00

K P Bagchi & Company
286 B. B. GANGULI STREET, CALCUTTA-700 012
I-1698 CHITTARANJAN PARK, NEW DELHI 110 019

দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

'সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত, কখনও নোয়াইতে পারে নাই ; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে ; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই ; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল'—আজ থেকে তিরানব্বই বছর আগে কলকাতায় এমারেল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত এক স্মৃতি-সভায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই উক্তি করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে। রামেন্দ্রসুন্দরের ১২৫তম জন্মবর্ষে এই অসামান্য মনীষার বিচারে প্রবৃত্ত হলে তাঁর ব্যবহৃত এই শব্দের অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয় তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে।

আজকের ছন্নছাড়া বাঙালি জীবনে আত্মানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা অন্তর্মিত। স্বভাবতই নিজেদের ঐতিহ্যের সম্পদভাণ্ডারে তালাচাবি লাগিয়ে বাঙালি আজ সন্তুষ্ট ভিক্ষালব্ধ ধনে। আমাদের অতীত থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের কোনো স্থির পরিকল্পনা নেই এবং বর্তমানের বিচার আমরা করে থাকি নিছক তাৎক্ষণিক লাভক্ষতির মানদণ্ডে। সর্বোপরি ক্ষমতা আর বিত্তের আকণ্ঠ পিপাসায় আমরা এমনই আকুল যে নিষ্কলঙ্ক মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদের কাছে এখন সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই পরিস্থিতিতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো অনন্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতি আমাদের কাছে ধূসর হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

রামেন্দ্রসুন্দরের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র পঞ্চান্ন বছরের। কিন্তু অসামান্য কর্মনিষ্ঠায় এই স্বল্প জীবনকেই তিনি আশ্চর্যজনকভাবে ফলবান করে তুলে-ছিলেন। এ ছাড়া, তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক আর সংগঠক, বিজ্ঞানী আর দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিক আর ভাষাতত্ত্ববিদ এবং অবশ্যই এক আদর্শনিষ্ঠ, নির্ভীক দেশপ্রেমিক। তাঁর গভীর প্রজ্ঞা প্রখর বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জন্ম দিয়েছিল এক কঠোর যুক্তিবাদী মননের যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমস্ত রচনাতেই। অনুপম গদ্যশৈলী ছিল তাঁর রচনার আর-এক বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা সমকালীন বাঙলা সাহিত্যে তিনি এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। বস্তুত, বাঙলা ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। এই কারণেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রায় জন্মলগ্ন থেকে তার সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছিলেন সর্বশক্তি দিয়ে। আবার এই

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে লিখিত।

অনুরাগে অটল ছিলেন বলেই তিনি তাঁর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রণয়ন করেছিলেন বাঙলা ভাষায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন নিয়মানুযায়ী ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল বলে তিনি দুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি-বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নীতির প্রতি সম্মান জানিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নিয়ম পরিবর্তন করা হলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় আমন্ত্রিত বক্তৃতা দেন যা পরে "যজ্ঞকথা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর জীবদ্দশায় নিজেই লিখেছিলেন: 'বাঙলা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থনা' ("আত্মকথা", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী))। তাঁর সমগ্র কর্মজীবন প্রমাণ করে যে, তাঁর এই প্রার্থনা ছিল কত আন্তরিক। রামেন্দ্রসুন্দরের অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলে-ছিলেন: 'বাঙলার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে সাধারণত লিপিনৈপুণ্যের অভাব দেখা যায় না; কিন্তু স্বাধীন মননশক্তির সাহস ও ঐশ্বর্য অত্যন্ত বিরল। মনন ও রচনারীতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যা ছিল তাঁহার প্রভুত, কিন্তু সেই বিদ্যা তাঁহার মনকে চাপা দিতে পারে নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার বিষয়বিচারে অথবা তাহার লেখনপ্রণালীতে অন্য কাহারও অনুবৃত্তি ছিল না।··· দেশের প্রতি তাঁহার প্রীতির মধ্যেও তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা ছিল।···তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানগাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সঙ্গত হইয়াছিল' (ভূমিকা, "রামেন্দ্রসুন্দর জীবন-কথা", আশুতোষ বাজপেয়ী)। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দরের পরম সুহৃদ। তবে রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্যে কোনো প্রীতিজাত অতিশয়োক্তি ছিল না; এই মূল্যায়ন ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং অবশ্যই অভ্রান্ত।

দুই

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৮৬৪ সালের ২০শে অগস্ট বঙ্গপ্রদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন জিঝৌত্রিয়া ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত; তাঁর জন্মের একশ বছর আগে তাঁর পূর্বপুরুষেরা মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড থেকে এসে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী এবং মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী। গণিতে, বিজ্ঞানে আর সাহিত্যে গোবিন্দসুন্দরের সবিশেষ অনুরাগ ছিল, এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গভীর স্বদেশপ্রীতি আর নির্ভীকতা। পিতার এইসব গুণই কালক্রমে পূর্ণতা লাভ করে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে আর সাধনায়। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতৃবিয়োগ হয় সতেরো বছর বয়সে। ইতিমধ্যে চোদ্দ বছর বয়সে স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তাঁর বিবাহ হয় ইন্দুপ্রভা দেবীর সঙ্গে। ইন্দুপ্রভা দেবী চার সন্তানের জন্ম দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্রসন্তান দুটির মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় জন্মের মাত্র এক বছর পরে, অপরটি জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়। দুই কন্যার মধ্যে প্রথমা চঞ্চলা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন, তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৮৪ সালে। দ্বিতীয়া কন্যা গিরিজা মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবদ্দশাতেই পরলোকগমন করেন ১৯১৮ সালে।

রামেন্দ্রসুন্দরের স্কুলজীবন শুরু হয় ১৮৭০ সালে। ১৮৭৫ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে তিনি সরকারি বৃত্তি পান। ১৮৮১ সালে কান্দি

হাই স্কুলের ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এর পর ভরতি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৮৩ সালের ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান এবং ১৮৮৬ সালের বি.এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞান অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি এম.এ. পরীক্ষা দেন এবং বিজ্ঞানশাখায় প্রথম হন। এর এক বছর পর পদার্থ- ও রসায়ন-বিদ্যায় তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে ১৮৯২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রিপন কলেজে পদার্থ- ও রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০৩ সালে তিনি রিপন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরের সাংগঠনিক দক্ষতায় রিপন কলেজের প্রভূত উন্নতি ঘটে। মূলত তাঁরই উদ্যোগে কলেজের নিজস্ব বাড়ি নির্মিত হয়, কলেজে উঁচুমানের গ্রন্থাগার আর বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক লড়াই করে কলেজের আইনবিভাগটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং ১৯১৫ সালে বি.এসসি শ্রেণী খোলা হয়। এ ছাড়া, রামেন্দ্রসুন্দরের আমলেই কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৫৬০ থেকে বেড়ে ২০০০-এ দাঁড়ায় এবং তাঁরই টানে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মতো বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা রিপন কলেজ ছেড়ে অন্যত্র যান নি।

একইভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের সংগঠনী প্রতিভার স্পর্শে প্রাণময় ও কর্মময় হয়ে ওঠে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু মাস পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদে নির্বাচিত হন এবং জীবনের বাকি পঁচিশ বছরে এই প্রতিষ্ঠানের নানা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুর ছয় দিন আগে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। এই পঁচিশ বছর ছিল সাহিত্য পরিষদের জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যার পিছনে রামেন্দ্রসুন্দরের অবদান ছিল বিপুল। তাঁরই উৎসাহে, উদ্দীপনায় আর অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিষদের নিজস্ব বাড়ি নির্মিত হয়, পরিষদের লাইব্রেরি, সংগ্রহশালা ও পরিষদ-পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হয় এবং বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। সাহিত্য পরিষদের সেবায় রামেন্দ্রসুন্দরের এই আজীবন আত্মনিয়োগ অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন এই ভাষায়: 'সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়-পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্লান্তের দ্বারা ক্লান্তকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।'

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর পূর্বপুরুষদের মতোই ছিলেন স্বল্পায়ু। সাতচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর শারীরিক অবনতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং আট বছর ধরে এক-টানা রোগভোগের পর ১৯১৯ সালে ৬ই জুন তাঁর জীবনাবসান ঘটে। প্রিয়জনের মৃত্যুশোকও তাঁকে পেতে হয়েছিল বার-বার। কিন্তু এই রোগশোকযন্ত্রণার মধ্যেও কর্তব্যপালনে তিনি ছিলেন অবিচল এবং তাঁর লেখনী ছিল পুরোমাত্রায় সচল। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন তিনি বি.এ. শ্রেণীর ছাত্র তখনই তাঁর লিখিত প্রবন্ধ "নবজীবন" পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এইভাবে লেখকজীবন শুরু হওয়ার পনেরো বছরের মধ্যেই তিনি এক বিশিষ্ট মননশীল দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রামেন্দ্র-সুন্দরের লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭, এর মধ্যে কয়েকটি ছিল তাঁর মরণোত্তর প্রকাশনা। এ ছাড়া তিনি ছয়টি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং অন্যান্য লেখকের রচিত আঠারোটি গ্রন্থের অতি মূল্যবান ভূমিকা লেখেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষয়বৈচিত্র্য ছিল লেখক রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; তাঁর চিন্তার

স্বচ্ছন্দ বিহার ছিল জ্ঞানের বিভিন্ন রাজ্যে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর চিন্তার গভীরতা এবং মননের প্রাখর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর দর্শনভাবনা। বস্তুত, বৈজ্ঞানিক, সংগঠক ও শিক্ষাবিদ রামেন্দ্রসুন্দর অপেক্ষা দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবমূর্তি অনেক বেশি ভাস্বর হয়ে আছে বাঙালি চিন্তার ইতিহাসে।

তিন

আজীবন বিজ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দর্শনের ভাবলোকে আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, 'দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ নাই' ("পঞ্চভূত", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। তাঁর মতে, অমুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগতের মূল উপাদান-গুলিকে শনাক্ত করাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মূল লক্ষ্য, এবং এই বিচারে দার্শনিকও এক অর্থে বৈজ্ঞানিক। আবার ব্যাপক অর্থে শুধুমাত্র দার্শনিক নয়, প্রতিটি মানুষই একজন বৈজ্ঞানিক। কারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাতায়ন দিয়ে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা নিরন্তর এসে জড়ো হচ্ছে মানুষের মনে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারবোধের সহায়তায়, মানুষ তাকে কাজে লাগাচ্ছে জীবনরক্ষার স্বার্থে। জীবনযুদ্ধের অনুকূলে বহির্জগৎ সম্পর্কিত এই অভিজ্ঞতার ব্যবহারই, রামেন্দ্রসুন্দরের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বৈজ্ঞানিকতা। তাই তিনি মনে করেন, 'অরণ্যবাসী মনুষ্য যেদিন ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া শস্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই শস্য আগুনে পাক করিয়া আরণ্য ওষধির ফলকে সুপথ্য অন্নে পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাত-সারে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লাবরেটরিতে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী কারখানা অগ্রাপি চলিতেছে' ("মায়াপুরী", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)।

অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর সম্পূর্ণ সচেতন যে বিজ্ঞানীর এই পদ্ধতি দার্শনিকের বিশ্লেষণপদ্ধতি থেকে পৃথক। বস্তুত, তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য এক হলেও তাঁদের প্রণালী, পথ আর ভাষা স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানী জড়জগৎকে বিশ্লেষণ করেন নানা যন্ত্রসহযোগে, কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ক্রিয়াবিক্রিয়ার মাধ্যমে, এবং শ্রম-সাপেক্ষ সূক্ষ্ম পরিমাণ আর গণনার সাহায্যে। অন্য-দিকে দার্শনিকের একমাত্র উপকরণ তাঁর অন্তরিন্দ্রিয় বা মন আর বুদ্ধি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই অন্তরিন্দ্রিয়ে যে চেতনার সঞ্চার করে, দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাই হল বহির্জগতের অস্তিত্বের একমাত্র অভিজ্ঞান। যে বস্তু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দবিবর্জিত, অর্থাৎ যা বুদ্ধি এবং মনের অগোচর, দার্শনিকের কাছে তার কোনো অর্থ বা অস্তিত্ব নেই। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞানী বস্তুর স্বকীয়তায় বিশ্বাসী, আর মননের সক্রিয়তা স্বীকার করে নিয়ে শুরু হয় দার্শনিকের বিশ্লেষণ। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে বিশ্লেষণপদ্ধতির এই পার্থক্য সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ থাকা সত্ত্বেও রামেন্দ্রসুন্দর দর্শন-ভাবনার সাগরে ডুব দিয়েছিলেন কতকগুলি বিশেষ কারণে।

প্রথমত, তাঁর ধারণা ছিল এই যে, বিজ্ঞানী সফলতা তথা পূর্ণতা লাভ করেন তখনই যখন তিনি একইসঙ্গে দার্শনিক। তাঁর মতে, মানুষের ব্যবহারিক স্বার্থের অনুকূলে জড়জগতের ওপর প্রভুত্বস্থাপনই বিজ্ঞানীর একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে এই জগতে পরিব্যাপ্ত নিয়মশৃঙ্খলার অফুরন্ত সৌন্দর্য আবিষ্কার করে বিশুদ্ধ আনন্দলাভও বিজ্ঞানীর এক পরম প্রাপ্তি। বস্তুত, রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেন যে, দার্শনিকের ভূমিকায় বিজ্ঞানী যখন এইভাবে জগতের আনন্দযজ্ঞের অংশীদার, তখন প্রমাণিত হয় ঋষিদের উচ্চারিত সেই আপ্ত বাক্য যে, 'বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।' দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানমনস্ক রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সবিশেষ

সচেতন ছিলেন। অবশ্য এই সীমাবদ্ধতার জন্য তিনি বিজ্ঞানকে দায়ী করেন নি। তাঁর মতে, মানুষের প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার কারণেই বিজ্ঞানের সীমা-বদ্ধতা। তাই দেখা যায় যে, জগতের অনেকটাই প্রত্যক্ষগোচর নয় এবং এইখানে বিজ্ঞানী তাঁর কর্মধারা সচল রাখতে অনিবার্যভাবে আশ্রয় নেন অনুমান আর কল্পনার। বস্তুত, পৃথিবীতে অনেক 'কেন'র জবাব দিতে বিজ্ঞান এখনও অক্ষম। তাই বিজ্ঞানের সত্য অনেক ক্ষেত্রেই অনুমাননির্ভর, কল্পিত সত্য। আবার বিজ্ঞানের সত্য পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানীর আজকের সিদ্ধান্ত আগামী দিনে বদলে যেতে পারে এবং এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সূচিত হয় বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি। কাজেই, রামেন্দ্রসুন্দরের বিচারে, বিজ্ঞান সন্ধান দেয় ব্যবহারিক সত্যের, পারমার্থিক সত্যের নয় এবং বিজ্ঞানসাধনায় ধ্রুব সত্যের কোনো স্থান নেই। কিন্তু সনাতনী ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত রামেন্দ্রসুন্দর পারমার্থিক সত্যের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেছিলেন, তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন ধ্রুব সত্যের অন্বেষণে এবং অনুভব করেছিলেন যে, দর্শনের বিমূর্ত জগৎই এই অন্বেষণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বিজ্ঞাননিষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শনে আকৃষ্ট হওয়ার এই ছিল দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয়ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অটুট বিশ্বাস ছিল মনুষ্যত্বের মহিমায়। জগৎসংসারের সুবিশাল প্রেক্ষাপটে মানুষ এক নিতান্ত দীন ও ক্ষুদ্র জীব—এ কথা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। 'ইতিহাসে একই ঘটনা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে; জ্ঞানের ইতিহাসেও একই সত্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়া পুনরাবৃত্ত হয়। মানুষ ক্ষুদ্র নহে' ("কে বড়?", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) —এই ছিল তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় মানুষের শক্তি আর সামর্থ্যের সংকীর্ণতা প্রতিফলিত হতে দেখে, বিজ্ঞানের পথে মানুষের চূড়ান্ত বিজয়ের অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করে তিনি বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে প্রবেশ করেছিলেন দর্শনের পরিমণ্ডলে। তিনি আশা করেছিলেন যে, দার্শনিক উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে মানুষের মহিমা, প্রমাণিত হবে মনুষ্যজীবনের বিশালতা আর শ্রেষ্ঠত্ব। এই হল বিজ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরে উত্তরিত হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

চার

দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর জ্ঞান-তত্ত্ব যা ছিল তাঁর "জগতের অস্তিত্ব", "সৃষ্টি" ও "এক না দুই?" এই তিন গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। এই জ্ঞানতত্ত্বে বস্তু এবং মননের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে রামেন্দ্রসুন্দর উপনীত হয়েছিলেন এক বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্তে আসার আগে তিনি ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য খণ্ডন করেছিলেন। এই সমালোচনার পাশা-পাশি তাঁর ইতিবাচক বক্তব্যও ছিল সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং সবিশেষ সাহিত্যমূল্যে অলংকৃত। জ্ঞানের বিষয়ী আর বিষয়—এই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকরণের মধ্য দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানতত্ত্বের সূত্রপাত। তাঁর মতে, যে জানে সে আমি। কাজেই আমিই জ্ঞানের বিষয়ী এবং আমার পরিপার্শ্বে যে বহির্জগৎ যার অন্তর্ভুক্ত আমি নই, তাই আমার জ্ঞানের গোচর; অতএব আমি ছাড়া যে বহির্জগৎ তা হল জ্ঞানের বিষয়। এখানে আমি বলতে বোঝায় আমার মন এবং এই মন বাদ দিয়ে আমার যে দেহ তাও বহির্জগতের অঙ্গ হিসাবে আমার জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ, মানুষের জ্ঞানপ্রক্রিয়ায় সূচিত হয় দুই জগতের অস্তিত্ব—একটি অন্তর্জগৎ বা মনোজগৎ, এবং অন্যটি বহির্জগৎ বা বস্তুজগৎ। কিন্তু এই দুই জগতের মধ্যে সংযোগ এবং সম্পর্ক কী ধরনের? প্রকৃতপক্ষে কি এ দুটি পরস্পরের থেকে পৃথক দুই জগৎ, অথবা জ্ঞান-রাজ্যে জগৎ একটিই, দুটি নয়? এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সর্বপ্রথমে দৃষ্টি মেলেছেন

বস্তুবাদীদের দিকে।

বস্তুবাদী মনোজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। স্বভাবতই বস্তুবাদীর চোখে জগৎ শুধুমাত্র একটিই, এবং সে জগৎ জড়জগৎ। জড়জগতের প্রতিটি উপাদান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জড়পদার্থ মস্তিষ্কে যে আলোড়নের সঞ্চার করে তা থেকেই উদ্ভূত হয় এই জড়পদার্থ সম্পর্কিত জ্ঞান। কাজেই বস্তুই জ্ঞানের উৎস। অবশ্য জড় পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গোচর নয়। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কে যে আলোড়ন দেখা দেয় তা জড় পদার্থের গতির প্রভাবে। বস্তুত, গতি ছাড়া জড়ের অস্তিত্ব নেই। গতিশীলতাই হল জড়ের ধর্ম। এই গতির অর্থ পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন স্থানগত আর কালগত। বস্তুবাদী আরও দাবি করেন যে, মানুষ এই গতিময় বস্তুজগতের এক অংশমাত্র। মানুষের জীবন প্রকৃতপক্ষে নানাবিধ গতির সমাহার, মানুষের শরীর এবং এই শরীরের অন্তর্গত তার মস্তিষ্ক নিতান্তই জড় পদার্থ। এই কারণেই বস্তুবাদী মনোজগতের বা অন্তর্জগতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁর কাছে একমাত্র সত্য সর্বব্যাপক জড়জগৎ, গতি যার ধর্ম, এবং তিনি মনে করেন যে, এই গতির সহায়তায় জ্ঞানের উদ্ভব। রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ করেছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় বস্তুবাদী তত্ত্বে যুক্ত হয়েছে আরও দুই সিদ্ধান্ত। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, জড় নিত্য অবিনাশী পদার্থ, তার সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই। দ্বিতীয়ত, জড়জগতে বস্তু ছাড়া আর-এক পদার্থ আছে যা হল শক্তি। এই শক্তির সাযুজ্যেই জড় পদার্থে গতির উদ্ভব হয় এবং বাইরের বস্তু থেকে এই শক্তি এসে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে বলেই আমরা সেই বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করি। আধুনিক বিজ্ঞান দাবি করে যে, জড়ের মতো শক্তিরও কোনো বিনাশ নেই।

বস্তুবাদের কোনো সিদ্ধান্তই, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, জড় আর শক্তি অবিনাশী পদার্থ—বিজ্ঞানলব্ধ এই সত্যকে শাশ্বত-সত্যরূপে গ্রহণ করতে পারে নি তাঁর যুক্তিবাদী মন। তাঁর মতে, জড় আর শক্তির কোনো ধ্বংস নেই—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ভূয়োদর্শনের ভিত্তিতে, আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে। 'কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কত দিনের? আমাদের ভূয়োদৃষ্টি কত দূর ব্যাপিয়া আছে? বিশাল জগতের অতি সংকীর্ণ প্রদেশ যে কয়টা দিন ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসিতেছি, সেই অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা লইয়া অত লম্বা কথাটা বলিয়া ফেলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। জড় অনশ্বর, শক্তি অনশ্বর—সর্বদা সর্বত্র অনশ্বর, ইহা বলিবার আমাদের কোনই অধিকার নাই। কালই এমন একটা নূতন প্রদেশের আবিষ্কার হইতে পারে, যেখানে জড় পদার্থের অহরহ সৃষ্টি হইতেছে, অথবা শক্তির অহরহ সংহার হইতেছে' ("এক না দুই?", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। দ্বিতীয়ত, জড়ের অস্তিত্ব সম্পর্কেই রামেন্দ্রসুন্দর সবিশেষ সন্দিহান। তাঁর মতে, জ্ঞানপ্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জড় পদার্থ নিতান্ত এক কল্পিত সংজ্ঞা, কারণ প্রত্যক্ষভাবে যা আমাদের জ্ঞানগোচর তা জড় নয়, তা প্রকৃতপক্ষে শক্তি। জড় পদার্থে নিহিত শক্তির প্রভাবে জন্ম নেয় গতি এবং এই গতিই আমরা অনুভব করি আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। কাজেই যে জড় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে নির্ভর করে বস্তুবাদের বিস্তার, সেই জড় পদার্থ নিতান্ত কল্পনামাত্র। অবশ্য জড়কে বাদ দিলেও শক্তি থেকে যায়, এবং এই শক্তির অস্তিত্ব ও সক্রিয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বস্তুবাদী দাবি করতে পারেন তাঁর তত্ত্বের সত্যতা। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের আপত্তি এখানেও। তাঁর মতে, শক্তিরও কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তা নিছক মানুষের মননকৃত ধারণামাত্র। যেমন, আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এগুলি প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিত্তিতে মননের সৃষ্ট কতকগুলি প্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এই প্রত্যয় বাদ দিলে যে-কোনো ধরনের শক্তিরই কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

অতএব জড়ের মতো শক্তিও এক কল্পিত পদার্থ। এই বিচারে সমস্ত জড়জগৎ বা বহির্জগৎই একটা কল্পনা এবং এই কল্পনার পাশাপাশি যার অস্তিত্ব পরম সত্য হয়ে ওঠে তা হল মনোজগৎ, এবং তার সক্রিয়তা।

এই মনোজগৎ বস্তুবাদে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনে বস্তু ও মনন—এই উভয়কেই স্বীকার করে নিয়ে বস্তুবাদ আর ভাববাদ এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের যে চেষ্টা করা হয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে তার উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর মতে, যাঁরা এই সমন্বয়ের প্রবক্তা তাঁরা স্বীকার করেন যে, জগৎ প্রকৃতপক্ষে দুটি—একটি মনোজগৎ বা অন্তর্জগৎ, অন্যটি জড়জগৎ বা বহির্জগৎ। এই দুই জগতের অস্তিত্বই স্বীকার্য, কারণ এই দুই জগতের সঙ্গেই আমাদের পরিচয়। দ্বিতীয়ত, এই দুই জগতের মধ্যে চলে নিত্য আনাগোনা, স্বভাবতই একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বোঝাতে সাংখ্যদর্শনে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে চিহ্নিত করা হয়েছে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে এবং বলা হয়েছে যে, এই দুইয়ের মধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্যের সম্পর্ক। অর্থাৎ, পুরুষ ভোক্তা এবং প্রকৃতি ভোগ্যা, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু এই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের অজ্ঞাত। অর্থাৎ, অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ—এই উভয়ের অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা অনুধাবন করি শুধুমাত্র তাদের বহিঃরূপ দেখে, তাদের অন্তর্নিহিত স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অগোচর। এই রহস্যময়তার মূলে রয়েছে সাংখ্যদর্শনে অভিহিত 'অব্যক্ত প্রকৃতি' অথবা জার্মান দার্শনিক কান্ট্-কল্পিত 'noumenon' বা স্বরূপের বিচিত্র লীলা। আমাদের মনোজগৎ আর বস্তুজগতের স্বরূপ নির্ধারিত আর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে স্বরূপের সক্রিয়তায়, এবং এই সক্রিয়তার কারণ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। রামেন্দ্রসুন্দর অবশ্য এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেন নি, কারণ এতে স্পষ্টতই স্বীকৃত হয়েছিল দ্বৈতবাদ যা কোনোভাবেই তাঁর অদ্বৈতবাদী দার্শনিক জিজ্ঞাসার সহায়ক ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিশাল জগতের প্রেক্ষাপটে মানুষ যে আদৌ ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ নয়, এই সত্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য, এবং এই কারণেই তিনি মানুষের মননশক্তিকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত স্বরূপকে মনন আর বস্তুর চূড়ান্ত নিয়ামক রূপে স্বীকার করে নিলে স্বাভাবিকভাবেই মননের দীনতা আর হীনতা মেনে নিতে হয়। কাজেই যদিও রামেন্দ্রসুন্দর নিজে স্পষ্ট করে বলেন নি, তবুও সহজে অনুমান করা যায় যে, এই কারণেও তিনি স্বরূপের কার্যলোক থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলেন।

বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে রামেন্দ্রসুন্দর অবশেষে পেশ করেছেন তাঁর অদ্বৈতবাদ-নির্ভর ভাববাদী দর্শন যাকে তিনি নিজে অভিহিত করেছেন "আত্মবাদ" বা "চেতনাবাদ" নামে। তাঁর মতে, জ্ঞানপ্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে বহির্জগৎ বা জড়-জগতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তা সম্পূর্ণরূপে আমার সৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞাতা-আমির সৃষ্টি। 'আমাকে ছাড়িয়া ব্যক্ত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। উহা আমারই কল্পনা বা কারিগরি। জ্ঞান-বিস্তারের সহিত জগতের একটু, আর একটু, আর একটুর সহিত ক্রমশ আমার পরিচয় হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে; আমারই চেতনার বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে সৃষ্টি, বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, বরং ঠিক' ("সৃষ্টি", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। অর্থাৎ, আমি আছি, তাই জগৎ আছে। বহির্জগৎ সম্পর্কিত যে সংবেদনরাশি আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সতত ঢেউ তুলছে আমার অন্তর্লোকে তা থেকে জন্ম নিচ্ছে আমার অনুভূতি। আমার অন্তঃস্থ চেতনা বা সংবিৎ-এর সক্রিয়তায় এই খণ্ড-খণ্ড অনুভূতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে এবং স্থান আর কালের বিচারে সু-সজ্জিত হয়ে যে অখণ্ড এবং স্থির প্রত্যয় উৎপন্ন করছে,

সেই প্রত্যয়কে বাদ দিলে, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, বস্তু-জগতে আর কিছুই থাকে না। যেমন, 'ঐখানে সবুজ রঙের ঘাস রহিয়াছে; এইখানে আমি রহিয়াছি। সবুজ রঙটা বস্তুত ঘাসের নহে। সবুজ রঙ আমার মনে আছে। উহা আমার অনুভবমাত্র। আমার মনে ঐ অনুভূতিটা জন্মিতেছে; তাহা হইতে আমি অনুমান করিতেছি যে, আমার বাহিরে ঐ স্থানে ঘাস পদার্থটা রহিয়াছে। ঘাসের অস্তিত্বের কল্পনা আমার এই অনুভূতি হইতেই উৎপন্ন' ("বর্ণতত্ত্ব", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। কাজেই রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত এই যে, জগৎ এক ও অদ্বিতীয় এবং সে জগৎ মনোজগৎ বা চেতনার জগৎ—সমগ্র বহির্জগৎ বা বস্তুজগৎ যার সৃষ্ট ফল মাত্র।

রামেন্দ্রসুন্দর এইভাবে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে অদ্বৈত-বাদের প্রতিষ্ঠা করলেও আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বর্ণিত মনোজগতের মধ্যেই দ্বৈতকে শনাক্ত করা যায়। কারণ, যে জ্ঞাতা-আমিকে তিনি বহির্জগতের স্রষ্টা বলে ঘোষণা করেছেন, সেই আমির মধ্যেই লক্ষ করা যায় দুটি ভিন্ন সত্তা। এক আমি ইন্দ্রিয়বাহিত সংবেদন আর অনুভূতির উৎস। এই আমি দেখে, শোনে, চিন্তা করে, হর্ষবিষাদ অনুভব করে এবং ভয় পায়; এই আমি ইন্দ্রিয়াতীত নয় এবং অবশ্যই দেশ আর কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু এই সঙ্গে রয়েছে আর-এক আমি যে আমি জানে যে আমি দেখি, যে আমি জানে যে আমি শুনি, যে আমি জানে যে আমি চিন্তা করি। অর্থাৎ, এই বৃহৎ আমি দেশ, কাল ও ইন্দ্রিয়ের অনুগত ক্ষুদ্র আমির উর্ধ্বে উঠে ক্ষুদ্র আমির লব্ধ খণ্ড-খণ্ড-অনুভূতিগুলিকে দেশ আর কালের পরিপ্রেক্ষিতে যথাবিহিতভাবে সাজিয়ে, তাদের সংযুক্ত করে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে স্থির প্রত্যয়ের জন্ম দেয়। দেশ-কালোর্ধ্ব এই অপরিবর্তনীয় ও চেতনামণ্ডিত আমিই জ্ঞাতা আর স্রষ্টা।

দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর উপলব্ধি করেছেন যে, এই দুই আমির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে তাঁর অদ্বৈতবাদী অবস্থান বিপন্ন হয়ে পড়ে। স্বভাবতই তিনি এই সমস্যাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরাসরি আশ্রয় নিয়েছেন ভারতীয় বেদান্তে। তাঁর মতে, আপাত-অসম্ভব বলে মনে হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, আমিই আমার জ্ঞাতা, আবার আমিই আমার জ্ঞেয়। দেশ, কাল আর ইন্দ্রিয়ের অতীত যে আমি অপরিবর্তনের স্থিরতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ, কাল আর ইন্দ্রিয়ের অধীন আমির জাগতিক কার্য-কলাপ প্রত্যক্ষ করে সত্যকে প্রকট করে চলেছি সে আমি জ্ঞাতা আর অন্য আমি জ্ঞেয়। এই জ্ঞাতা আমি সম্পূর্ণ এক স্বাধীন সত্তা, তা জন্ম-জরা-মরণের ঊর্ধ্বে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, অথচ নিরগুণ ও অভিধা-হীন। অন্যদিকে জ্ঞেয় আমি জীবনমৃত্যুর সংকীর্ণতায় চিহ্নিত এবং পার্থিব লীলায় সতত মগ্ন। তথাপি এই দুই আমি, রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিতে, পৃথক নয়। 'এই দুই আমিই এক; দুই আমি অভিন্ন; যে দেখে ও যাহাকে দেখে, দুই-ই এক। ব্যবহারে দ্বয়, পরমার্থত অদ্বয়। বেদান্তের ভাষায় একের নাম জীব, অপরের নাম ব্রহ্ম। জ্ঞেয় আমি জীবাত্মা, জ্ঞাতা আমি পরমাত্মা। ব্যবহারে দুই; কিন্তু বস্তুত এক। ব্রহ্মই জীব—জীবই ব্রহ্ম—কেন না, আমিই আমাকে দেখি। আমিই সেই—সোঽহম' ("এক না দুই?" রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী)। ব্রহ্ম আমি, জ্ঞাতা আমি নিজেরই সৃষ্ট মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে জ্ঞেয় আমিকে জীবরূপে নিজের থেকে পৃথক হিসাবে দেখছি। অন্যদিকে এই মায়ার প্রভাবে জাত অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে জীবরূপে আমি নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবি এবং ব্রহ্ম বলে নিজেকে আবিষ্কার করতে অক্ষম হই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম আর জীব এক আর অভিন্ন এবং, বস্তুত, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে চলেছে এই সত্য যে জগৎসংসারে এক ছাড়া দুই নেই এবং সেই এক আমি।

পাঁচ

সন্দেহ নেই, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর দর্শনে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। তবে লক্ষণীয় যে, এই অদ্বৈতবাদে তিনি পৌঁছেছিলেন অধিবিদ্যার পথ ধরে। অন্যভাবে বলা যায় যে, রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শনের মূল কথা আধিবিদ্যক অদ্বৈতবাদ। এই আধিবিদ্যক অদ্বৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শন-চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাববাদী দর্শনের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন, প্লেটোর মতোই রামেন্দ্রসুন্দর মনোজগতের স্বাতন্ত্র্য আর সক্রিয়তায় বিশ্বাসী, বহির্জগৎ সম্পর্কিত সত্য ইন্দ্রিয়োর্ধ্ব মননের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত শূন্যতায় পর্যবসিত হয়—এই অভিমত প্লেটো আর রামেন্দ্রসুন্দর উভয়েরই। দ্বিতীয়ত, প্লেটোর দর্শনের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, যথার্থ জ্ঞান নিহিত আছে অখণ্ড এবং সর্বজনীন ধারণায়। প্রায় একইভাবে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন যে, জ্ঞান হল স্থির এবং অখণ্ড প্রত্যয়পুঞ্জ। অন্যদিকে হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনের উপাদানও লক্ষ করা যায় রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তায়। হেগেল বহির্জগতের ব্যাখ্যা করেছিলেন আত্মসচেতন মননের সৃষ্টিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে। বহির্জগতের মর্মমূলে রয়েছে এই আত্মসচেতন মনন—এই প্রত্যয়ের আলোকে হেগেল জ্ঞানের বিষয়ী আর বিষয়ের মধ্যে এক পরম ঐক্য স্থাপন করে আশ্রয় নিয়েছিলেন অদ্বৈতবাদে। এই দুটি ব্যাপারেই রামেন্দ্র-সুন্দর স্পষ্টতই হেগেলের অনুগামী। তবে ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিক টি. এইচ. গ্রীনের সঙ্গেই রামেন্দ্র-সুন্দরের মিল সবচেয়ে বেশি। গ্রীনের মতোই রামেন্দ্র-সুন্দর কান্টের 'noumenon' বা স্বরূপের মধ্যে দ্বৈতবাদের অঙ্কুর আবিষ্কার করে তাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। দ্বিতীয়ত, ঠিক গ্রীনের মতোই রামেন্দ্র-সুন্দর ইন্দ্রিয়বাহিত সংবেদনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এই খণ্ড-খণ্ড, বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলির মধ্যে সমন্বয় আর শৃঙ্খলারক্ষার কাজে মননের অনন্য ভূমিকার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন যে, বস্তু-জগৎ মননেরই সৃষ্টি। তৃতীয়ত, রামেন্দ্রসুন্দরের পরমাত্মা বা ব্রহ্ম অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় গ্রীনের 'eternal conciousness' বা অনন্ত চেতনার কথা। গ্রীন তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে অধিবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে দেখিয়ে-ছিলেন যে, বস্তু মননের সৃষ্টি এই অর্থে যে, মানুষের চেতনার মধ্যে নিহিত আছে কালাতীত অনন্তচেতনা এবং এই অনন্তচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত মানব-চেতনার সক্রিয়তায় বস্তু লাভ করেছে তার অস্তিত্ব। রামেন্দ্রসুন্দর গ্রীনের এই আধিবিদ্যক ধারণার খুবই কাছাকাছি এসে দাঁড়ান যখন তিনি বলেন, 'কে একজন ভিতরে বসিয়া বসিয়া জীবের এই পরিবর্তন-পরম্পরা ঘটিতে দেখিতেছে, নিজের তাহার বিকার নাই। এই নিত্যপরিবর্তনশীল বিষয় আমার পশ্চাতে আর এক আমি বসিয়া বসিয়া স্থিরভাবে এইসকল পরিবর্তন নিরীক্ষণ করিতেছে—সেই আমার স্পন্দন নাই, তাহার চক্ষে নিমেষ নাই, তাহার কোন বিকার নাই, পরিবর্তন নাই।···এই নিষ্ক্রিয় নির্বিকার উদাসীন সাক্ষী আমি, বিষয়ী আমি।···এই বিষয়ী আমার নাম পরমাত্মা' ("মুক্তি", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)।

রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শন এইভাবে পাশ্চাত্যের ভাব-বাদী ঐতিহ্যের অনুগামী হলেও তার স্বকীয়তা উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুত, প্লেটো, হেগেল এবং গ্রীনের তত্ত্বের সঙ্গে দর্শনভাবনার যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। যে সত্য জ্ঞানের বিষয়, প্লেটো তাকে উপস্থাপিত করেছিলেন পূর্ণ এবং সনাতন এক আদর্শ সত্য রূপে। অর্থাৎ, প্লেটোর সত্যে বহুত্বের কোনো অবকাশ নেই, পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই, তা চিরন্তন ও অদ্বিতীয়। পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে রামেন্দ্রসুন্দর দেশ এবং কালের অতীত বলে গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, এই ব্রহ্ম যখন আবিরভূত বস্তুজগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানের বিষয়ী-রূপে তখন যে সত্য জ্ঞানের বিষয় তা ধ্রুব, অনন্ত

এবং কালাতীত হতে পারে না। কারণ জগতের যে অংশটুকু এই আমি জানে, কালের যে অংশের সঙ্গে এই আমির পরিচয় হয় দেশ ও কালের মাত্র সেই অংশই সত্য হয়ে ওঠে। 'ফলত, সত্য অর্থে যাহা আমাদের পক্ষে সত্য; নিরপেক্ষ নহে—সাপেক্ষ; পূর্ণ নহে—আংশিক; সার্বভৌমিক নহে—প্রাদেশিক; সনাতন নহে—তাৎকালিক' ("সত্য", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। রামেন্দ্রসুন্দর আরও মনে করেন যে, চিরন্তন সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে জ্ঞাতা আমির সৃষ্টিশীলতাকে অস্বীকার করতে হয়। কারণ, তাঁর ভাষায়, 'কাল আমারই সৃষ্টি, আমারই কল্পনা। কাল আমারই সহব্যাপী। আমি থাকিব না, কাল থাকিবে, আমা-হীন কাল থাকিবে, ইহা অর্থহীন' ("আত্মার অবিনাশিতা", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)।

জ্ঞাতা আমির সৃষ্টিশীলতায় রামেন্দ্রসুন্দরের এই প্রবল বিশ্বাসের ভিত্তিতেই হেগেলের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, জ্ঞানের বিষয়ী আর বিষয়—এই উভয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন হেগেল ও রামেন্দ্রসুন্দর দুজনেই। কিন্তু এ ব্যাপারে এই দুই দার্শনিকের পদ্ধতি ছিল আলাদা। মনোজগতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হেগেল বহির্জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি। তিনি এই দুই জগতের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। হেগেলের মতে, বহির্জগৎ যেমন আত্মসচেতন মনের ক্রিয়াশীলতায় অন্তর্জগৎ হয়ে ওঠে, তেমনই বহির্জগতের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করে আত্মসচেতন মনও হয়ে ওঠে বহির্জগতের মতো বিষয়মুখী। বিষয়ী আর বিষয়ের এই পারস্পরিক সম্পর্ক কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর মেনে নিতে পারেন নি। তিনি এই দুইয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন একপক্ষীয় প্রভুত্বের মাধ্যমে, অর্থাৎ, প্লেটোর মতোই তিনি সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন শুধুমাত্র মনোজগৎকে, আর বহির্জগৎ তাঁর চোখে বিবেচিত হয়েছিল এই মনোজগতের সৃষ্ট ফসলরূপে। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'যাহা কিছু বাহিরে দেখিতেছ, যাহা কিছু ভিতরে দেখিতেছ, সবই আমার কল্পনা……সমস্ত জগৎটা আমারই কল্পিত' ("আত্মার অবিনাশিতা", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। এক কথায়, হেগেলীয় দর্শনের তুলনায় রামেন্দ্রসুন্দরের ভাববাদে মনোগামিতার মাত্রা অনেক বেশি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, টি. এইচ. গ্রীন এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—এই দুই ভাববাদী দার্শনিক ঈপ্সিত অদ্বৈতবাদী লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন অধিবিদ্যার পথ ধরে। গ্রীনের আধিবিদ্যক ধারণা গড়ে উঠেছিল তাঁর অনন্তচেতনার অস্তিত্ব ও সক্রিয়তা সম্পর্কিত কল্পনার ভিত্তিতে। অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের আধিবিদ্যক তত্ত্বের কেন্দ্রে ছিল ব্রহ্মসম্পর্কিত বৈদান্তিক ধারণা। আপাতদৃষ্টিতে গ্রীনের অনন্তচেতনা এবং রামেন্দ্রসুন্দরের ব্রহ্ম অভিন্ন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভাববাদী গ্রীনের জ্ঞানতত্ত্বে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, মননই হল বস্তুর স্রষ্টা। তবে একই সঙ্গে গ্রীন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিমনের অবদানেই বস্তুজগতের অস্তিত্ব। তাঁর মতে, ব্যক্তিমনের ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয়লোকে রয়েছে এক অনন্ত, সর্বজনীন মন যার অনন্তচেতনার স্পর্শে অস্তিত্ব লাভ করছে বস্তুজগৎ। তবে মানুষের মনই হল এই অনন্ত চেতনার বাহক। অর্থাৎ, ব্যক্তিসত্তা প্রকাশের জৈব মাধ্যম। স্বভাবতই মানুষের মন এই অনন্তচেতনার অংশীদার হিসাবে বহির্জগতের স্রষ্টা। গ্রীনের এই আধিবিদ্যক অবস্থানে স্পষ্টই ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাঁর অদ্বৈতবাদ এবং এখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। গ্রীনের তত্ত্বে ব্যক্তিসত্তা বর্ণিত হয়েছে অনন্ত সত্তার বাহক হিসাবে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য না থাকলে একের পক্ষে অন্যের বাহক হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, গ্রীনের দর্শনে ব্যক্তিসত্তা আর অনন্তসত্তা এক ও অভিন্ন নয়, এবং এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় গ্রীনের অদ্বৈতবাদের সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের

অদ্বৈতবাদ নিঃসন্দেহে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। বেদান্তের শিক্ষায় পরিপুষ্ট রামেন্দ্রসুন্দর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। জীবাত্মা পরমাত্মারই আর-এক রূপ এবং পরমাত্মা এই রূপ গ্রহণ করেছেন নিজেরই সৃষ্ট মায়াবলে। রামেন্দ্রসুন্দরের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা।

কিন্তু এই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ যেমন দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের সাফল্যের দ্যোতক, তেমনই তা তাঁর ব্যর্থতারও পরিচায়ক। কারণ এই অদ্বৈতবাদের গোমুখে রামেন্দ্রসুন্দর পৌঁছেছেন যুক্তির বন্ধুর পথ দিয়ে নয়, নিছক আধিবিদ্যক বিশ্বাস সম্বল করে। তাই দেখা যায়—কে এই ব্রহ্ম, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কী, কেন এই পরমাত্মা আপনাতে জীবধর্ম আরোপ করে জীবাত্মারূপে জগতের নিয়মাধীন—এইসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর সম্পূর্ণ নিরুত্তর এবং যুক্তিপ্রয়োগে অক্ষম। তাই তাঁর মনে হয়—'চিদ্বস্তুর মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই' ("জগতের অস্তিত্ব", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী), 'তাহার উত্তর বোধ করি নাই' ("মায়া-পুরী", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী), 'বলিতে পারি না……বাক্য যেখানে গিয়া প্রতিহত হয়; মনও সেখানে নিবৃত্ত হয়;—বলিব কিরূপে, বুঝাইব কিরূপে' ("এক না দুই?" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)।

আজীবন যুক্তিবাদী রামেন্দ্রসুন্দরের এ-এক বিস্ময়কর পশ্চাদপসরণ। এখানে যুক্তিনিরপেক্ষ বিশ্বাসের কাছে স্পষ্টতই পরাভূত হয়েছে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা। আরও মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুভব করেই রামেন্দ্রসুন্দর আগ্রহী হয়েছিলেন দর্শনজিজ্ঞাসায়। তাঁর মনে হয়েছিল যে, বৈজ্ঞানিক কেবল দ্রষ্টামাত্র এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত বহু মূল প্রশ্নের উত্তরদানে তিনি অক্ষম। এইসব প্রশ্নের সদুত্তর দেবে দর্শন—এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি দর্শনের জগতে শুরু করেছিলেন তাঁর পরিক্রমা। কিন্তু তাঁর বেদান্ত-নির্ভর জ্ঞানতত্ত্বে তিনি নিজেই শেষ পর্যন্ত এই উত্তর দিতে না পেরে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর নিজের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই প্রমাণ করে যে, বিজ্ঞানের মতো দর্শনের অন্বেষণের জগৎও সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া নির্‌গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর নিমজ্জিত হয়েছেন স্ববিরোধিতার আবর্তে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই স্বীকার করেছেন যে যা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ অথবা শব্দের অনুভূতি উজ্জীবনে অক্ষম, অর্থাৎ যা আমাদের বুদ্ধি এবং মনের অগম্য, দার্শনিকের কাছে তা অর্থহীন শূন্যতা। অথচ যে নির্‌গুণ ব্রহ্ম সমস্ত মানবানুভূতির ঊর্ধ্বে, যা সম্পূর্ণরূপে আমাদের বুদ্ধির অগোচর, সেই ব্রহ্মকেই চরম সত্য বলে রামেন্দ্রসুন্দর আঁকড়ে ধরেছেন তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে।

সুশিক্ষক, সুসংগঠক ও বিজ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী চিন্তাবিদ হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, সাবধানী এবং একান্তভাবে যুক্তিনিষ্ঠ। কাজেই একথা মেনে নেওয়া যায় না যে, তাঁর মতো তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে তাঁর ব্রহ্মবাদের অস্পষ্টতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা। অর্থাৎ, তিনি নিতান্ত সচেতনভাবেই আশ্রয় নিয়েছিলেন বেদান্তের ব্রহ্মবাদে। দর্শনে কেন তাঁর এই প্রমাণনিরপেক্ষ সত্যে আশ্রয় গ্রহণ—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলে রামেন্দ্রসুন্দরের তত্ত্বের জগৎ অতিক্রম করে দেশপ্রেমী রামেন্দ্রসুন্দরের মনের খবর নেওয়া দরকার। রামেন্দ্রসুন্দরের বাল্যকালেই তাঁকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করেছিলেন পিতা গোবিন্দসুন্দর এবং সারা জীবন ধরে নানা চিন্তা আর কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর অকৃত্রিম দেশানুরাগ। রামেন্দ্রসুন্দর অবশ্য ব্যবহারিক রাজনীতিতে কোনো দিন যুক্ত হন নি। তবে তাঁর সামাজিক আর রাজ-

নৈতিক চিন্তাধারা এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁর বহুমুখী উদ্যোগ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরাধীন দেশবাসীকে আত্মশক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তাদের আত্মবিশ্বাসী, নির্ভীক আর কর্মনিষ্ঠ করে তোলাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, পরাধীনতায় বিপন্ন জাতির জড়তা দূর করাই ছিল দেশপ্রেমী রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মহান ব্রত।

রামেন্দ্রসুন্দর নিজে কখনও উল্লেখ না করলেও অনুমান করা যায় যে, এই ব্রত পালনে অগ্রণী হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যাঁর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মের এক বছর আগে এবং ১৯০২ সালে যখন বিবেকানন্দের লোকান্তর ঘটে তখন রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে অধ্যাপনারত। কাজেই বিবেকানন্দের সঙ্গে একই কালের পরিধিতে আবদ্ধ রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন আর সাধনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ ঘটেছিল, এবং স্বভাবতই এই অনন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। দেশব্রতী বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন জাতির জাগরণ ঘটিয়ে। তবে পরাধীনতায় লাঞ্ছিত দেশবাসীকে জড়তামুক্ত করে তাদের সংকল্পে আর প্রত্যয়ে স্বাধীন আর আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য বিবেকানন্দ বেছে নিয়েছিলেন এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষ ক্ষুদ্র জীব নয়, সে অসীমশক্তিধর বিপুল-মহিমামণ্ডিত। দেশবাসীর কানে এই মানবশক্তির বাণী পৌঁছে দিতে বিবেকানন্দ আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতীয় বেদান্তে এবং ব্রজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন এই অদ্বৈতবাদী মন্ত্র যে মানুষ নিজেই সেই অক্ষয়, অব্যয় পরমপুরুষ। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন বিবেকানন্দের প্রদর্শিত এই পথেরই পথিক। বিবেকানন্দের মতোই তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি তৈরি করতে চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের মহিমা প্রচার করে। এই কারণেই যুক্তিবাদের বন্ধন ছিন্ন করে তিনি তাঁর দর্শনভাবনায় শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন বৈদান্তিক বিশ্বাসকে।

ধারাবাহিকতা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
উঠেছে নতুন বাড়ি—
ঠাণ্ডা, শান্ত, চোখ-জুড়োনো রং,
দরজা-জানলার বড়ো-বড়ো পরদায়
উজ্জ্বল গহন সব দৃশ্যমালা :
আবহমান আমন্ত্রণ।

কারা থাকে অমন সুন্দর বাড়িতে ?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেল বাজালাম।
চোখের সামনে দুলছে
উপত্যকা ঝরনাস্রোত পুষ্পিত বনানী
সুদূরে বিলীন বনপথ
ঝরা পাতায় ঢাকা।
কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সাবধানে আস্তে-আস্তে পরদা সরালাম।
ভেতরে ধুলো রাবিশের উপর
পালে-পালে ধেড়ে ইঁদুর
ইতস্তত ফণিমনসার ফাঁকে-ফাঁকে
লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে॥

তৃষিত আকুল আঁখি

পরিমল চক্রবর্তী

বলো তো এবার কাকে ডাকি।
কিছু নেই কাছাকাছি···কেউ নেই,
কেউ নেই···কিছু নেই;
শুধু আছে একজোড়া তৃষিত আকুল গাঢ় আঁখি
এই আর্ত হৃদয়ের কাছে।

দুপুরের সঙ্গিহীন বটগাছে-গাছে
তাই শুনি,
শুধু শুনি,
স্বদেশী পাতার ধীর সম্পন্ন মর্মর;
আর সেই স্থির শব্দে মুগ্ধ হয়ে আকাঙ্ক্ষিত ঘর
বাঁধি আমি স্বপ্নে তাকে নিয়ে—
যে এখনো বেঁচে আছে অন্ধকারে শরীর রাঙিয়ে॥

নিশিপালন

রফিক উল ইসলাম

মৃত টেলিফোন ঝাঁকিয়ে কেন শাসাও মাঝরাতে?
স্বর ছিঁড়ে রক্তধারা চুঁইয়ে নামে
টেবিলের ওপর,
তারপর ছুটে যায় বাথটবের জলে!
অদূরে নির্বাণপল্লী বাসন্তী রঙের জ্যোৎস্না মেখেছে,
তার দু পায় জড়ানো আমার শব্দের ঘুঙুর
ছমছম বেজে ওঠে
নরবলির রাতে।
বেপাড়ায় যাব না আজ···
আধোঘুম থেকে শরীর টেনে তুলে
মঙ্গলকাব্যের শেষ অনুচ্ছেদে গড়াগড়ি দেব।
মুঠোর ভেতর দলাপাকানো ঘিলুর সাবান,
নিশিরমণীর স্তনের মতো আলগোছে মেখে নেব
চামড়ার আবরণ তুলে।

রঙিন জলে শোরগোল তুলেছে
নিষ্ফল রক্তধারা,
বেপাড়ায় যাব না আজ,
কালিঝুলিমাখা শরীর ভেঙে-ভেঙে
বাথটবে ডোবাব।
পাশেই ইজেল জুড়ে অস্পষ্ট আদিরূপ, তুলি ও ব্রাশ,
শাদা রঙের কৌটো থেকে ভোর নামবে নতমুখে,
নিশিপালনশেষে
তার চোখের তারায় এঁকে দেব
নীলপদ্মের দিনলিপি।

পাপপুণ্য-২

কামাল হোসেন

অতলে খেলা করে রুপালি মাছ
শিশুর ছোটাছুটি যেন, নিষ্পাপ, বিশুদ্ধ হৃদয়
তাদের ঘরবাড়ি, পাড়াপড়শি, হৃৎস্পন্দন

বিষয়টা হৃদয় সংক্রান্ত, এরকম ভেবে
কবিকে তোমরা বন্দী কোরো না জ্যামিতির ফাঁদে :
একটা শূন্যতা, পাথুরে স্তব্ধতা, গুহার অন্ধকারে
লুকোনো প্রজ্ঞা, তার আবহমানতা—
এসব স্পর্শ করতে কবিকে মাঝে-মাঝেই
করতে হয় অবগাহন, পাপপুণ্যের অতলে,
অনেক গভীরে

অতলে খেলা করে রুপালি মাছ
অবোধ শূন্যতায়, বস্তুময় স্পন্দন ধীরে-ধীরে
টেনে আনে সন্ধ্যা, নিষ্প্রভতা :
আরো একটি রাত্রি এগিয়ে আসে।

আধুনিক বাঙলা কবিতায় চিত্রকল্প

সুজিৎ ঘোষ

এক

আধুনিক বাঙলা কাব্যের আলোচনায় "চিত্রকল্প" শব্দটির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-আলোচনায় আলঙ্কারিকেরা "চিত্রকাব্য" বলে কাব্যের একটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। কিন্তু এই শ্রেণীভুক্ত কাব্যকে তাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর কাব্য বলেছেন : যা শুধু 'শব্দে চিত্রিত' অথবা 'ভাবে চিত্রিত' তাকেই চিত্রকাব্য বলে অভিহিত করেছেন। এই বিভাগের মধ্যে সেই ধরনের কাব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ধ্বনিমাধুর্যে বা চিত্রিত উপস্থাপনার সৌন্দর্যে অথবা এ-ধরনের যান্ত্রিক উপায়ে শ্রুতিসুখকর ও প্রশংসাযোগ্য। যে-সমস্ত অলঙ্কার ব্যঞ্জনাহীন, শুধু বৈচিত্র্যের জন্যে আবেদন সৃষ্টি করে, তাদেরও এই চিত্রকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। তাহলে "চিত্রকাব্য"কে 'কাব্য'-শ্রেণীতে না ফেলাই যুক্তিযুক্ত হতে পারত, কেননা এ ধরনের রচনা আসলে এক ধরনের অনুকরণ বা নকল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কবিরা অবাধ কাব্য রচনাকালে প্রকাশরীতিতে এ ধরনের কাব্য রচনা করেন, যাতে ব্যঞ্জিত অর্থ বিকশিত করার কোনো প্রয়াস লক্ষিত হয় না, বরং কোনো-কিছুর সঙ্গে ধ্বনি এবং অর্থের সাদৃশ্য দেখানোর জন্যেই তা রচিত।

দুই

শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার চিত্রের রূপ ফুটিয়ে তুললেও ভারতীয় সাহিত্যসমালোচনায় অলঙ্কারের নিজস্ব মূল্য নেই। চিত্রকল্প ও অলঙ্কারের পার্থক্য স্পষ্ট করতে বলা চলে যে, চিত্রকল্পমাত্রেই কোনো না কোনো অলঙ্কারের বিভাগের মধ্যে পড়বে, কিন্তু অলঙ্কারমাত্রেই চিত্রকল্প নয়। যেমন অনুপ্রাস বা শ্লেষ অলঙ্কার চিত্রকল্পের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না।

আধুনিক কাব্যের আলোচনায় চিত্রকল্প শব্দটি আমরা ইংরেজি ইমেজ-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। কাব্যের কোরকে বা সারাৎসারে রয়েছে চিত্রকল্প। বহু চিত্রকল্পের সমাহারে সমগ্র কবিতা একটি একক চিত্রকল্প। কাব্যের ক্ষেত্রে এ ধারণার ব্যাপক প্রসার ঘটে রোমানটিক আন্দোলনের কাল থেকেই।

তাহলে চিত্রকল্প কাকে বলব ? সিসিল ডে লুইস বলেছেন,

In its simplest terms, it is a picture made out of words. An epithet, a metaphor, a simile may create an image ; or an image may be presented to us in a phrase or passage on the face of it purely descriptive, but conveying to our imagination something more than the accurate reflection of an external reality. (The Poetic Image)

চিত্রকল্পের অর্থকে লুইসের মতো বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করলে শুধু রোমানটিক পর্বের কাব্যেই নয়, যে-কোনো ভাষার সাহিত্য-ইতিহাসের যে-কোনো পর্বের কাব্যেই চিত্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

তিন

বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বাঙলা কাব্যে রোমানটিক যুগের প্রবর্তন বলা চলে। কিন্তু এঁদের বহু আগেও বাঙলা কাব্যে চিত্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যাবে।

চর্যাপদের কাল থেকেই শব্দের শরীর অবলম্বনে ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অবশ্য, চর্যাপদের কাব্যরূপের মধ্যে নিহিত রূপক হীনযান বৌদ্ধ সাধকদের কাছে চর্যার শুদ্ধ কাব্যত্ব অপেক্ষা বক্তব্যকেই প্রধান করে তুলেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু, কাব্য শব্দসমর্পিত। শব্দের ব্যঞ্জনা কাব্যে শব্দের অভিধার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে। সে কারণেই চিত্রের দ্বিমাত্রিক সীমা বা ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিক সীমার বন্ধন কবিতা অতিক্রম করতে পারে।

আধুনিক কাব্যে “চিত্ররূপকল্প” কবিতার “কথা” প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। চিত্ররূপকল্পের প্রধান প্রয়াস হল বিমূর্তকে মূর্ত ধারণায় নিয়ে আসা এবং একই সঙ্গে চিত্তে আবেগের উদ্‌বোধন ঘটানো। প্রাচীন কবিতায় এই প্রয়াস সচেতন কবিভাবনার অন্তর্গত নয়, আধুনিক কবি সচেতনভাবেই এই চিত্র-রূপের সন্ধানে ব্যাপৃত।

চর্যাপদের কবি যখন লেখেন,
উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥

[উঁচু-উঁচু পর্বত, তথায় শবরী বালিকা বাস করে, ময়ূরপুচ্ছপরিহিতা সেই শবরীর গলায় গুঞ্জাফুলের মালা।]

—তখন এ-বর্ণনায় ছবি বা চিত্রকল্প ফুটে ওঠে এবং সে ছবি, সাধারণ প্রাত্যহিক হওয়া সত্ত্বেও, কাব্যিক। কিন্তু কাব্যিক হয়েও প্রাত্যহিকতার জন্য এ ছবি আধুনিক কাব্যের চিত্ররূপের মতো বিমূর্ত হয়ে ওঠে না।

তবু লক্ষণীয় যে, চর্যাপদ বা বৈষ্ণব পদাবলীতে গোষ্ঠীগত ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটলেও চিত্ররূপ আবেগ উদ্‌বোধিত করতে সমর্থ। শুধু আবেগের উদ্‌বোধন নয়, আবেগতীব্রতা গীতিকাব্যের লক্ষণা-ক্রান্ত করে, এসব কাব্যের শ্রেষ্ঠ পদ শব্দের অভি-ধার্থকে বারে-বারেই অতিক্রম করে যেতে চায়।

রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণবকাব্যের এই দিকটি লক্ষ করে-ছিলেন। তিনি বলরাম দাসের একটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন—‘দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়।’ মন ও চক্ষুর দর্শনব্যাকুলতা—ধাবমান পাখির উড্ডীন বেগ-যুক্ত রূপটি আমাদের চেতনায় বিমূর্ত ও সুপ্ত আবেগকে জাগিয়ে তোলে।

চার

চিত্ররূপনির্মাণের ব্যাপারে আধুনিক কবিতা প্রাচীন মধ্যযুগের কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। সে স্বাতন্ত্র্য আধুনিক কবিদের সচেতনতায়, সচেতনভাবে চিত্ররূপসৃষ্টির প্রয়াসে। ফলে, আধুনিক কাব্যে বিমূর্তকে মূর্ত করে তোলার সনাতনী কার্যকরতার সঙ্গেই মূর্তকেও বিমূর্ত করে তোলার জন্যে চিত্ররূপ ব্যবহৃত। যেমন—

আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে (বিষ্ণু দে)

স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝঙ্কার, (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

বা,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে
(জীবনানন্দ)

নদীর জলের প্রবাহে তীরের মাটি নরম হয়ে যায়—এই প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষের বিবৃতিতে যেখানে কাব্যত্ব অনুপস্থিত, সেখানে চিত্রকল্পে স্পর্শ ও ঘ্রাণের বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ- ও মূর্ততা-অতিক্রমী ‘নরম জলের গন্ধ’ বিমূর্ততার রূপ নির্মাণ করে, এবং আবার প্রত্যক্ষের সীমার মধ্যে নিয়ে আসে, ঘ্রাণ ও স্পর্শের বোধের মধ্যে দিয়ে তা প্রত্যক্ষ অনুভবের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্র-গানে ‘অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে’ ধরনের চিত্ররূপকল্পে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ, মূর্ত-বিমূর্তের একাকার রূপ—এ রূপ চিত্র বা ভাস্কর্যের প্রত্যক্ষতার সীমা থেকে মুক্ত।

পাচ

কাব্যে চিত্ররূপকল্পের প্রাধান্য অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন নয়। সাহিত্যশিল্পের শাশ্বত দোলনে কাব্য বিশেষ যুগে বিশেষ ভাষায় কখনো ভাবপ্রধান, কখনো বা বক্তব্য-প্রধান। বক্তব্যপ্রাধান্য পাঠক-লেখককে ক্লান্ত করলে আসে ভাবের প্রাবল্য বা বিপরীতে বক্তব্যের প্রাধান্য। খেজুরে অরুচি হলে তেঁতুল এবং তেঁতুলে অরুচিতে খেজুর—চলতেই থাকে। এ কথা শুধু সাহিত্যের ইতি-হাসের পর্ব থেকে পর্বান্তরেই প্রযোজ্য নয়, বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের রচনার এক পর্বের সঙ্গে অন্য পর্বেরও এ বৈপরীত্যের সৃষ্টি হতে পারে। সে কারণেই জীবনানন্দের

“বনলতা সেন” পর্বের সঙ্গে “বেলা অবেলা কালবেলা” পর্বের বাচনভঙ্গি ও প্রকাশের পার্থক্য ঘটে যায়। আমরা ভাব- বা আবেগ-প্রাধান্যের সঙ্গে চিত্ররূপকল্পের সমীকরণ করছি। এই নিয়মের শাসন সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকলে, কোনো ক্ষেত্রেই নির্বিশেষে বলা যাবে না যে বক্তব্যপ্রধান কবিতার চেয়ে ভাবপ্রধান চিত্র-রূপকল্পসমন্বিত কবিতা শ্রেষ্ঠতর বা বিপরীতটি সত্য। চিত্ররূপনির্মাণের মনোহারিত্বের গুণ যেমন আমাদের মুগ্ধ করতে পারে, তেমনি ঋজু বক্তব্য তার কমনীয় দার্ঢ্যে পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে।

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ-জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

—এ কাব্য বক্তব্যপ্রধান, চিত্ররূপকল্পের বর্ণাঢ্যতা অনুপস্থিত। তথাপি কাব্যত্বের অভাব ঘটে না।

ছয়

চিত্ররূপের সংবেদের প্রাথমিক পন্থা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় তথা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক। মানব-কায়াতরুবরের এই পাঁচটি ডালের মধ্যে দিয়েই পার্থিব রূপ-শব্দ-গন্ধ রস-স্পর্শের জগৎ আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, মনে ও মননে : প্রত্যক্ষ বাস্তবের সংশ্লেষ ঘটে। তাই দৃশ্য-শ্রুতি-ঘ্রাণ-আস্বাদ-স্পর্শের অনুভব-গুলির উদ্‌বোধন শারীরিক হলেও, তা শুধু শারীরিক বোধের সীমাতেই নিঃশেষিত হয় না। বরং সে-বোধ রতি-হাস-শোক-ক্রোধ-উৎসাহ প্রভৃতির মতো মনে রসের বা ভালোলাগার ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

তাই দৃশ্যের সীমার মধ্যে কবির অভিজ্ঞতা আমাদেরও অভিজ্ঞতায় এক ও অভিন্ন হতে পারে।

‘আকাশে কাগ ডিমে রং লাগে’ (অবনীন্দ্রনাথ)
বা,

'তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার'
(বুদ্ধদেব বসু)

—এই চিত্ররূপকল্প শব্দের দ্যোতনায় দৃশ্যকে বিম্বিত করে, তাই এগুলিকে দৃশ্যচিত্ররূপকল্প (ভিজুয়াল ইমেজ) বলে অভিহিত করা চলে। আধুনিক বাঙলা কাব্যে দৃশ্য-চিত্ররূপকল্পের প্রাচুর্য প্রায় সীমাহীন—

'চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দূরন্ত সিঁদুর
পরাস্ত মুহূর্ত-টিপ'
(অমিয় চক্রবর্তী)

'বাতাসেরা সব বাসায় পালালো মেঘের মুষ্টি হতে'
(বিষ্ণু দে)

'গলানো সোনার মতো রোদ'
(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

'চারিদিকে স্থূলে পড়ে ফলেছে ফসল
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে
শিশিরের জল'
(জীবনানন্দ)

'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়'
(ঐ)

'অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল'
(ঐ)

'পিয়ালার মতো দুটি বক্ষপদ্মে উড়ে গেলো দৃষ্টির ভ্রমর'
(আল মাহমুদ)

ইত্যাদি উদাহরণে শব্দের সাহায্যে দৃশ্যচিত্রনির্মাণের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচলিত অলঙ্কারের হিসাবে এর বিভিন্নটি সমাসোক্তি, উপমা, রূপকের বিভাগের অন্তর্গত। এবং বিমূর্তকে দৃশ্য করে তোলার মধ্যেই এ ধরনের চিত্ররূপকল্পের সার্থকতা। কিন্তু কবি যখন লেখেন,

'টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশ'
(জীবনানন্দ)

বা,

'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে'
(অমিয় চক্রবর্তী)

তখন প্রাকৃত অন্ধকারের গাঢ়তা প্রত্যক্ষতা থেকে যূথচারী নিরুদ্দেশে অপ্রত্যক্ষ বা বিমূর্ত হয়ে ওঠে, আবার বৃষ্টিঝরার প্রকৃত বাস্তবতাও মনের মাটির রূপকে মূর্ত থেকে বিমূর্তে যাত্রা করে।

সাত

দৃশ্যনির্ভর চিত্ররূপকল্পগুলি বাদে শ্রুতি-ঘ্রাণ-আস্বাদ-স্পর্শনির্ভর ইমেজগুলিকে চিত্ররূপকল্প বলে অভিহিত করলে ব্যাকরণগত ত্রুটি থেকে যায়। ইংরেজিতে কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক-নির্ভর ইমেজকেও ইমেজ বলা হয়েছে, শুধু দৃশ্য-ইমেজকে নয়। বাঙলায় আমরা সবগুলিকে একত্রে 'চিত্ররূপকল্প' বললে এই ব্যাকরণ-গত ত্রুটি এড়ানো যায়।

শ্রুতি-চিত্ররূপকল্পে (অডিয়ো-ইমেজ) আমাদের বোধের গভীরে শব্দের বিভিন্ন দ্যোতনাকে সক্রিয় করে তোলে :

'ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর
আর গান
বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাক্কায়'
(অবনীন্দ্রনাথ)

'ক্লাশে পড়ানোর ঘণ্টা ওই বাজে, ব্যস্ত হাওয়া'
(অমিয় চক্রবর্তী)

'বিকেলের উইলো বনে রেড অ্যারো ট্রেনের হুইসিল
শব্দশেষ ছুঁচে গাঁথে দূর শূন্যে দ্রুত ধোঁয়া নীল'
(অমিয় চক্রবর্তী)

'ধূমায়িত পল্লীপথে ঘণ্টা গোধূলির' (প্রমথনাথ বিশী)

'এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি
মহুয়া-বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর বিশাল শব্দ'
(সমর সেন)

আবার ফিরে আসা, সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি—
রাবেয়া রাবেয়া
আমার মায়ের নামে খুলে যাওয়া দন্ধিদের
ভেজানো কপাট' (আল মাহমুদ)

এই শ্রুতি-চিত্ররূপকল্প যে ধ্বনির ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তা অনুপ্রাস বা যমকের ধ্বনিব্যঞ্জনা থেকে ভিন্ন, শ্রুতিচিত্ররূপকল্প আমাদের মনের বা বোধের জগৎকে শব্দের বিভিন্ন অনুষঙ্গে আলোড়িত করে, কখনো বা অবচেতনে প্রোথিত স্মৃতিকেও উদ্‌বোধিত করে।

অনুপ্রাস যমকে শব্দের বা ধ্বনির পৌনঃপুনিকতায় শ্রুতিসুখকরতা কানের পরদাতেই সীমায়িত, কিন্তু শ্রুতি - চিত্ররূপকল্প শুধু শ্রুতিসুখ নয়, আমাদের চেতনার গভীরে শব্দের সঙ্গে যুক্ত অনুষঙ্গকে জাগিয়ে তোলে।

আট

ঘ্রাণ-চিত্ররূপকল্পের (অলফ্যাকটরি ইমেজ) ব্যবহারে আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। জীবনানন্দ ছাড়াও অনেক কবিই ঘ্রাণ-নির্ভর চিত্ররূপকল্পের ব্যবহার করেছেন—

'নরম জলের গন্ধ'
(জীবনানন্দ)

'ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল'
(ঐ)

'পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের
ভাঁড়ারের দেশে'
(ঐ)

'কফির সুরভি, টোস্টে মাখনের স্বাদ' (অমিয় চক্রবর্তী)

শরীরী চৈতন্যে বাঁধা আমার সংগ্রহ
ও-ডি-কলোনের গন্ধ মাখা'
(ঐ)

'ভুলে যাওয়া গন্ধের মতো
কখনো তোমাকে মনে পড়ে'
(সমর সেন)

ওপরের চিত্ররূপকল্পগুলি শুধু নাসিকার ইন্দ্রিয়জ বোধেই পরিসমাপ্ত নয়, বরং তা মাটি ও জল, ডানা ও রৌদ্রের সম্পর্কের নৈকট্যকে কখনো ব্যক্ত করে, কখনো আমাদের ভাঁড়ারের প্রাচুর্যকে ব্যঞ্জিত করে, কখনো প্রবাসে শীতের সকালের (কফির সুরভি), রূপ, বিদেশের অনুষঙ্গ বা বিচ্ছেদের স্মৃতিকে মনে পড়িয়ে দেয়।

নয়

আস্বাদ্য চিত্ররূপকল্পের (ইমেজ অব টেস্ট) ব্যবহার তুলনায় দৃশ্যরূপকল্পের থেকে কম। কিন্তু বহু বাঙালি কবিই আস্বাদ্য চিত্ররূপকল্পের ব্যবহার করেছেন :

'স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ ? কে করে শোচনা
পান করি হৃনির্ভয়ে'
(মোহিতলাল)

'চোস্টে মাখনের স্বাদ মধু মেশা' (অমিয় চক্রবর্তী)

'রক্তিম গেলাশে তরমুজ মদ'
(জীবনানন্দ)

'চিনি-দানি থেকে
দু-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায় রোগা যুবা'
(অমিয় চক্রবর্তী)

'আনো তীব্র তপ্ত-ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ'
(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

এই চিত্ররূপকল্পনির্মাণে অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই দৃশ্য চিত্রকল্পও মিশ্রিত হয়ে থাকে। যেমন, সুধারস বা বিষের আধার হিসেবে 'স্বর্ণপাত্রে'র ব্যবহার, স্বর্ণপাত্রে দৃশ্য রূপে গ্রাহ্যতাকেও বিশিষ্ট করে তোলে। যেমন, গেলাসে তরমুজ মদের উপস্থিতির মদের আস্বাদ্যতার গুণে, কিন্তু উক্ত মদের উপস্থিতির জন্যেই গেলাশ রক্তিম, এবং এই রক্তিমতাই আবার আস্বাদ্যতার পাশাপাশি দৃশ্যরূপকেও স্পষ্ট করে তোলা আবার 'অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা পড়েছিলো তুলে নেবো তার শীতলতা'—এই শীতলতার বোধ একই সঙ্গে আস্বাদ্য ও স্পর্শের।

দশ

স্পর্শের বোধ (ট্যাকটাইল ইমেজ) মানুষের বোধ-গুলির মধ্যে আদিম ও মৌলিক। কবি প্রত্যক্ষের নানা স্পর্শের অনুভূতিকে চিত্ররূপকল্পনির্মাণের ক্ষেত্রে এড়িয়ে যেতে পারেন না। আধুনিক কবিরা স্পর্শের চিত্ররূপ-কল্পনির্মাণে বরং অনেক বেশি সাহসী। অবশ্য, রবীন্দ্র-কাব্যেই এই সাহসের সূচনা যখন চুম্বন কবিতায় লেখেন, 'অধরের কানে কানে অধরের ভাষা'। কিন্তু স্পর্শের বোধ বহুমুখী, চিত্ররূপকল্পের বৈচিত্র্যও তাই লক্ষণীয়।

'চিবুক ধরিয়া তুলিব আনন-কুসুম কলি'
(মোহিতলাল)

'হুঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে
খুর'
(জীবনানন্দ)

'যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার
ঠোঁটের চুমো ধরে' (ঐ)

'অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা পড়েছিল
তুলে নেবো তার শীতলতা' (ঐ)

'হাতে হাত ধরে ধরে, গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে'
(ঐ)

'মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে' (ঐ)

'সে এসে সহসা হাত রেখেছিলো হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

'ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ রচে পরম আত্মীয় অন্ধকার'
(মণীশ ঘটক)

স্ফুরৎ প্রবাল ওষ্ঠে গূঢ় কথা চুম্বন-উৎসুক'
(অচিন্ত্য সেনগুপ্ত)

'চোখের পাতা চায় চোখের চুম্বন' (শঙ্খ ঘোষ)

—এ ধরনের চিত্ররূপকল্পে স্পর্শ দৃশ্যের বা ঘ্রাণের চিত্ররূপকে সর্বদা স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে খুঁজলে ভুল হবে এবং সেই অনুসন্ধান কাব্য-উপভোগের অনুকূল নাও হতে পারে। তবে, আমরা সহজেই লক্ষ করব যে বহু চিত্ররূপকল্পই মিশ্র। যেমন, 'হাতে হাত ধরে ধরে, গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে'—এখানে একই সঙ্গে স্পর্শের চিত্ররূপ ও গোল হয়ে ঘোরার দৃশ্যচিত্রকল্পই মিশেই চিত্ররূপের সামগ্রিকতা পূর্ণ করেছে।

এগারো

বিশিষ্ট কবিদের অনেক কবিতাই পাওয়া যাবে, যে কবিতা বহু চিত্ররূপকল্পের সমাহারে একটি সমগ্র সম্পূর্ণ চিত্ররূপের সৃষ্টি করে কাব্যিক ভাব প্রকাশিত হয়েছে, যেমন, জীবনানন্দের "মৃত্যুর আগে", অমিয় চক্রবর্তীর "চেতন স্যাকরা"।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় চিত্ররূপনির্মাণের দক্ষতায় আমাদের বিস্মিত হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে "পাল্কীর গান" বা "দূরের পাল্লা'র মতো কবিতাগুলিতে ছুটি শব্দের এক-একটি কাব্যিক চরণে তিনি যে দক্ষতায় এক-একটি সম্পূর্ণ চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলেন, তা তাঁর চিত্ররূপকল্পনির্মাণের ক্ষমতাই প্রমাণ করে :

চুপ চুপ—ওই ডুব
ছায় পানকৌটি,
দেয় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি।

অথবা

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা
রূপশালি-ধান ভানা
রূপ ছাখো তোমরা।

আধুনিক কোনো কবি সত্যেন্দ্রনাথের মতো এতটা চিত্ররূপ নির্ভর হতে চান নি বলে মনে হয়। শুধু অশোকবিজয় রাহার "মায়াতরু" কবিতায় একটি সামগ্রিক চিত্ররূপের পরিচয় পাওয়া যায় :

এক যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দু-হাত তুলে জুড়তো ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠতো যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করতো সে গরগর
বৃষ্টি হলেই আসতো আবার কম্প দিয়ে জর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠতো হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেলো, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কী-যে
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হলো যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রুপালি এক ঝালর।

আধুনিক বাঙলায় বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেনের কাব্য বিচিত্র চিত্ররূপকল্পের ঐশ্বর্যে পূর্ণ। বিষ্ণু দের কবিতায় ইতিহাস পুরাণ ও সাহিত্যের উদ্ধৃতি। ক্রেসিডা ওফেলিয়া দামিনী প্রভৃতি

নায়িকাদের নামব্যবহারই নতুনতর চিত্ররূপের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। বিষ্ণু দে, সমর সেন ও অতি আধুনিক মণিভূষণ ভট্টাচার্যে রবীন্দ্র-কবিতা গানের চরণের উল্লেখও একধরনের বিশিষ্ট চিত্ররূপ নির্মাণের প্রবণতা, যা এলিয়টে বলা চলে সূচনা ; মণিভূষণের "গান্ধীনগরে এক রাত্রি" কবিতায় এ-ধরনের চিত্ররূপের পরিচয় পাওয়া যায় :

'উনুনে জলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের
তেজী রক্তধারা,
গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিলো তারা।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শঙ্খ ঘোষ এবং আরো পরবর্তী বাঙালি কবিদের কাব্যে চিত্ররূপকল্পের নির্মিতির নানা নতুন প্রয়াস লক্ষ করা যাবে।

বারো

সিসিল ডে লুইস তাঁর আলোচনায় চিত্ররূপকল্পের প্রকৃতি, ক্ষেত্র এবং রীতিসমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বাঙলা কাব্যের আলোচনাতে, বা কবিদের বিভিন্ন পর্বের কাব্যের আলোচনায় আমরা চিত্ররূপকল্প নির্মাণের বৈচিত্র্য এবং বক্তব্যপ্রাধান্য ও চিত্ররূপপ্রাধান্যের আপাত হ্রাস-বৃদ্ধির বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কিন্তু কাব্যের স্বীকৃতি বক্তব্যের প্রাধান্যেও নয়, বক্তব্যের গুরুত্বেও নয়। কাব্যের স্বীকৃতি বক্তব্যের চিত্ররূপ সমন্বিত শব্দ-সমর্পিত শরীরে।

'Yet the image is the constant in all poetry, and every poem is itself an image. Trends come and go, diction alters, metrical fashions change, even the elemental subject matter may change almost out of recognition ; but metaphor remains, the life-principle of poetry, the poet's chief test and glory.'
(*The Poetic Image*—C. Day Lewis, 1965, p. 17.)

কবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে উপমা বা ব্যাপক অর্থে চিত্রকল্পের সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার চিরকালই চলছে—তাই উপমা কালিদাসস্য কিংবা হোমারের উপমা তাঁদের কবিত্বগৌরব বাড়িয়েছে। মধুসূদনও যে কত বড়ো কবি, তার প্রাথমিক বিচার তাঁর উপমানির্মাণে এবং রবীন্দ্রনাথও উপমা তথা চিত্রকল্প নির্মাণে মহৎ কবিদের গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত॥

ক্ষতিপূরণ

মতি মুখোপাধ্যায়

আজ পনেরোই মে। ঠিকমতো হিসেব করলে এখনো তিন মাস ষোলো দিন—মানে একশ আট দিন বাকি রিটায়ারমেনটের। চাকরির শেষ দিন একত্রিশে অগস্ট। মাঝে থাকছে জুনের তিরিশ আর জুলাইয়ের একত্রিশ দিন। হঠাৎ মনে পড়ে যায়—স্কুলে সুদ-কষার অঙ্ক করার সময় এভাবে সময়ের হিসেব করতে হত। "সময়ের হিসেব" কথাটাই কেমন হাস্যকর লাগে অমিতাভর। অনন্ত সময়সমুদ্র থেকে খানিকটা সময় তুলে নেওয়া। যে যেমন তুলতে পারে তুলে নিয়ে মাপজোক করে দেখছে। দরজির ফিতে ফেলে মেপে নিতে কারো ছত্রিশ ইনচি বুক আনন্দে ফুলে ফেঁপে বিয়াল্লিশ ইনচি হয়ে যায়। কারো মুখ বিষাদে মলিন দেখায়। ভাবে, জীবনে কীই-বা পেলাম। না করা গেল মনমতো পড়াশোনা, কি চাকরিবাকরি। আর্থিক সচ্ছলতা তো হলই না, শুধুই দিনগত পাপক্ষয়। এক টাকা দু টাকার দরাদরি করতেই জীবন কাবার; রোদ্দুর কাত হয়ে পাঁচিলে কি কারনিসে ঠেকেছে। শরীরেও সূর্যাস্তের আয়োজন। একবার বসলে ওঠা যায় না। উঠলে বসা কষ্টকর। লক-আপে পিটুনির মতো শরীরে ব্যথা। তবু ক্ষীণ আশা ডাক্তারের চেষ্টায় হয়তো ভাঙা শরীর একদিন জোড়া লাগবে। আবার টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে বিবেকানন্দের মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে···। ভাবনাকে থামিয়ে বেল বেজে ওঠে।

একটা মিষ্টি গানের সুর। বেশ কিছুক্ষণ বাজতে থাকে। দরজা খুলতে চৌধুরীবাবু জিজ্ঞেস করেন, 'আজ কি ছুটি?'

'না তো। বসুন।'

ঘড়ির দিকে চোখ চৌধুরীর, 'অফিস যাবেন?'

'হ্যাঁ, ম্যানেজারকে বলে এসেছি, দেরিতে যাব।'

'আপনার মশায় সুখের চাকরি', বলে আড়মোড়া ভাঙলেন চৌধুরী। 'তবে আর কদিন? জুলাইয়ের শেষ না?'

'না। অগস্টের শেষ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি তা-ই বলেছিলেন। অবিশ্যি যাঁহা বাহান্ন তাঁহাই তিপ্পান্ন। একসটেনশান তো দেবে না। ওসব পাটাপাট উঠে গেছে। বাঁচা গেছে, কী বলেন? চল্লিশ বছর সার্ভিসে থেকে কিছু হল না, আর দু-তিন বছরে কী এমন মধুসঞ্চয় হবে!'

'যা বলেছেন', বলে অমিতাভ পাশ কাটাতে চেষ্টা করেন। এসব আলোচনা আর ভালো লাগে না। খেলোয়াড়দের মতো ড্রিবলিঙ করে বলটা খানিকটা সরিয়ে নিতে পারলেও বিপক্ষের গোল-সীমানায় পৌঁছতে পারেন না অমিতাভ। প্রতিপক্ষ নাছোড়। চৌধুরী বলেন, 'আমার তো মশায় ইচ্ছে করে চাকরির শেষ দিনে সুপ্রীম কোর্টে মালিকের বিরুদ্ধে একটা মামলা ঠুকে দি। মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে। এই যে চল্লিশ বছর সার্ভিস দিলাম, কী পেলাম তার বিনিময়ে? বুকে হাত দিয়ে আপনি বলুন—যে শ্রম আর সময় দিয়েছেন চাকরিতে, তার যথার্থ বিনিময়মূল্য কি পেয়েছেন? গ্রাসাচ্ছাদন কি সব? রক্তে বেড়ে গেছে চিনির পরিমাণ, বেড়েছে রক্তচাপ, বায়ু-পিত্ত-কফ; আর্থরাইটিসে শরীর পঙ্গু হবার দাখিল। চোখে হাইপাওয়ারের চশমা। অথচ প্রথম যেদিন চাকরিতে এসেছিলাম সেদিনটা মনে আছে। একবার ভাবুন তো। লাউকুমড়োর ডগার মতো টলটলে তাজা চেহারাটা, কিশোরীদের মতো চনমনে মুখচোখ, কত আশা কত স্বপ্ন ছিল সেদিন!'

'ভেবে দেখেছি', অমিতাভ নিরুত্তাপ গলায় বলেন, 'কী লাভ ভেবে? এই যে শরীর, মন—এসব তো যত দিন যাবে খারাপ হবে। লাভের গুড় চিরদিন পিঁপড়েরা খেয়ে নেয়। আমরা বোকার মতো বাতাসে হাতপা ছুঁড়ি, তাই না?'

জুতসই একটা কথা বলতে পেরে অমিতাভ খুশি হন। কিন্তু এও জানেন—চৌধুরীবাবুর কথাটা মিথ্যে না। সত্যি, এবং এত সত্যি যে মুখোমুখি হতে অস্বস্তি হয়। শান্তির প্রয়োজনে ওইসব প্রসঙ্গ আলমারির উঁচু তাকে তুলে রাখা উচিত। যার কোনো প্রতিকার জানা নেই, থাকলেও সাধ্যের বাইরে, সেসব ভেবে মাথা ভার করা বুদ্ধিমানের কাজ না।

চৌধুরীবাবু যেন একটু পিছু হটে গিয়ে বলেন, 'ঠিক কথাই, তবে কি না আমরা তো মানুষ। একটা পাথর কি লোহার টুকরো নই যে যেমন খুশি আঘাত করে ভেঙে গলিয়ে কাজ করিয়ে নেবে? মানুষের একটা স্বাধীন মন আছে, অনুভূতি আছে, স্পর্শ-কাতরতা আছে। কী বলেন?'

ভেতর থেকে ডাক আসাতে অমিতাভ উঠলেন। চৌধুরীবাবুর আগমনবার্তা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে এবং চা প্রস্তুত। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে অমিতাভ ঘরে ঢুকে লক্ষ করলেন গতকালের বাসি কাগজটা চৌধুরীবাবু চোখের সামনে মেলে ধরেছেন। অমিতাভকে দেখে বললেন, 'খবর মানেই শাসকদল আর বিরোধী-পক্ষের কচকচি। জনসাধারণের সেবার জন্য কে-বা আগে প্রাণ করিবেক দান। এখন আবার দু পক্ষই দু পক্ষের দুর্নীতি খুঁজে বার করছে। উইচ হানটিঙ আর কী!'

'সে তো ভালোই। এভাবে একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি হবে।'

'সুস্থ পরিবেশ! আরে মশায়, ঠক বাছতে গাঁ উজোড়। যে দুর্নীতি ফাঁস করছে, তারই ভেতর আবার ঘুঘুর বাসার মতো দুর্নীতির আখড়া। যে কাগজ ছাপছে সে কি ধোয়া তুলসীপাতা? সারকুলেশানের ভেলকি দেখিয়ে নিউজপ্রিনটের কোটা বার করে কালোবাজারে বিক্রি করছে না? আসলে জনগণের নাম করে সবাই জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে।'

ঘড়ির দিকে তাকালেন অমিতাভ। চৌধুরী একবার জাঁকিয়ে বসলে ওঠার নাম করেন না। ওঁর চলছে লীভ প্রিপারেটরি টু রিটায়ারমেনট। কিন্তু অমিতাভকে দস্তুরমতো দশটা-পাঁচটা অফিস করতে হচ্ছে। অফিসে চুপচাপ হাতপা গুটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই। টেবিলে ফাইল-চিঠিপত্রের স্তূপ।

ম্যানেজারের ডাক। অধস্তনদের কাজ করানো নিয়ে টেনশান। ম্যানেজমেনট তো টারগেট বেঁধে দিয়ে খালাস, কিন্তু তার রূপায়ণ, মানে এগজিকিউশন ?'

আরো কিছু পরে চৌধুরী উঠলেন। যাবার আগে চেঁচিয়ে বললেন, 'বউদিদি আজ ভোজবাড়ির আইটেম বানাচ্ছেন না কি ?' হলুদ হাত তোয়ালেতে মুছতে-মুছতে জবাব সশরীরে দরজায় এসে বলল, 'কী সৌভাগ্য আমাদের ! নেমন্তন্নর কার্ডটা ছেপে আসার আগেই জানতে পেরে গেছেন ? কিন্তু একা এলে তো চলবে না। অন্তত যুগলে না হলে—'

চৌধুরীবাবু বিদায় নিতে অমিতাভ বেসের ঘোড়া হয়ে গেলেন। বাথরুম, ড্রেসিং, ডাইনিং টেবিল পরপর চরকি ঘোরার মতো ঘুরতে হবে। সময় কম। চৌধুরীবাবু না এলেও একই ব্যাপার। সেই ছোটা-ছুটি। মায়া বলেন, 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে, তোমারও তাই। একটু আগে থেকে তৈরি হতে পার না।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাতে-চালাতে অমিতাভ জবাব দেন, 'এখন নাটকের শেষ দৃশ্য। নায়কের অ্যাকটিং নিয়ে কমেনটের কোনো মানে হয় না।'

দরকারি কথাগুলো মনে করিয়ে দেন মায়া। 'রিঙ্কুকে ফোন করবে, শনিবার ওরা আসছে কিনা জেনে নেবে। সোমের হোস্টেলে গিয়ে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার, গত সপ্তায় আসে নি। শরীর-টরির খারাপ হল কিনা কে জানে।'

'আর কিছু ?'

'বাজার নেই।'

'কেন, ফ্রিজ ? ফ্রিজে কিছু নেই ?'

'খুলে দেখে নাও,' মায়া নিরুত্তাপ গলায় বলেন। 'ও হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, কাল থেকে ফ্রিজে আবার সেই আওয়াজটা হচ্ছে। মাঝে বন্ধ ছিল। মেকানিককে খবর দিতে হবে।'

অমিতাভর মাথার চুল শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কালো। বন্ধুরা বলে, 'কোনো প্রবলেম নেই। দিব্যি মজাসে আছ। তোমার চুল পাকবে কী করে ?'

অমিতাভ হাসেন। মিলিয়ে দিতে পারলে সবাই মজা পায়। একবার কে যেন বলেছিল, 'ঠিকঠাক মেলাতে পারলে একটা কবিতা হয়, জীবন হয় না।' কথাটা সত্যি। ওঁর বন্ধুদের মতো মানুষেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ। খুব সহজে ওরা একটা কারণ খুঁজে পায় এবং সেই কারণটাই যে যাবতীয় ঘটনার একমাত্র কারণ সেটাই প্রচার করে। কী উদ্ভাবন !

রাকা এসে দাঁড়াল।

অ্যাটাচি খুলে জিনিসপত্র দেখে নিচ্ছিলেন অমিতাভ। ফিরে তাকালেন। 'কী রে, কিছু বলবি ?'

রাকা বলল, 'কাল কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ছ মাসে কমপিউটার কোর্স। ভাবছি ভরতি হয়ে যাব।'

'হঠাৎ কমপিউটার ?' অমিতাভ একটু অবাক হয়ে বললেন।

'ওরা বলছে পাশ করলেই নাকি চাকরি। জব-ওরিয়েনটেড কোর্স। ওরাই চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে।'

'তাই নাকি ? এত সহজে চাকরি পাওয়া যাচ্ছে ?'

'তাই তো লিখছে,' রাকা বলে।

'ঠিক আছে। তোর ইচ্ছে যখন, ভরতি হয়ে যা। কিন্তু কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করতে হবে। ওখানে ট্রাম-বাসের যা অবস্থা ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে ওঠানামা করতে হয়। দরকারের সময় বাস পাওয়া যায় না। আবার কখন স্ট্যানডে বাসের লাইন পড়ে যায়। এলোমেলো ব্যাপার। যেখানেই থাকিস, ওভাবে যাতায়াত করতে পারবি ?'

'না পারার কী আছে ? মেয়েরা কি যাতায়াত করে না ?'

'কিন্তু', বলে চুপ করে গেলেন অমিতাভ। যে কথা বলতে যাচ্ছিলেন সেটা বলা উচিত হবে না ভেবে আর বললেন না। কথাটা হল গ্রাজুয়েট

হওয়ার পর রাকা পোস্ট গ্রাজুয়েট না পড়ে কেন কমপিউটার নিয়ে পড়তে চাইছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বিজ্ঞাপনে আছে পাশ করলেই নাকি চাকরি পাওয়া যাবে। অমিতাভ বিশ্বাস করেন না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় কথাটা ঠিক, তবু একটা প্রশ্ন অমিতাভ রাখতে চাইছিলেন মেয়ের কাছে। ওর চাকরি কি খুব দরকার ? সংসার কি চলছে না, নাকি যেভাবে চলার কথা সেভাবে না ? বুদ্ধিমতী রাকা কি বুঝে নিয়েছে বাবার অসহায় অবস্থা ? রিটায়ারমেনটের মুখোমুখি অনেক সমস্যা ভিড় করে আসে। সোম ইনজিনীয়ারিঙ পাশ করে না বেরুনো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। সবে থার্ড ইয়ার। পড়াশোনায় ভালো, নিশ্চয়ই কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করবে। কিন্তু অপেক্ষার সময় কই ? আর কয়েক মাস বাদেই বাবার চাকরি-জীবনের শেষ। তখনকার ভাবনা এখন থেকেই ভাবতে হচ্ছে। অবসর নিলে চাকুরে লোকেরা বড়ো বা ছোটো একটা কলসী পায়। বাকি জীবন সেই কলসীর জল গড়িয়ে-গড়িয়ে পিপাসা মেটানো। রাকার অবশ্য বাবাকে খুব চিন্তিত বলে মনে হয় না। হয়তো ভিতরকার অবস্থা প্রকাশ করতে চায় না। কখনো হালকাভাবে কথা বলতে গিয়ে নিজের অজানতে চাপা দুঃখ বেরিয়ে আসে। সেদিন খাবার টেবিলে মার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে-করতে বাবা বলেছিল, 'একটা কথা আছে না, ফুরোলে বাগানের আম কী খাবে হে হনুমান ?'

রাকার বন্ধুদের কারো-কারো বিয়ে হয়ে গেছে। ওর জন্যও খোঁজাখুঁজি চলছে। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে প্রায়ই চিঠি দেয় বাবা। উত্তর আসে। হয়তো পছন্দমতো না। তাছাড়া রাকা নিজেই বেঁকে বসে-ছিল। বলেছিল, 'এখন এসব থাক বাবা সোম আগে পাশ করুক।'

'এখনো দু বছর বাকি। তাছাড়া পাশ করলেও সঙ্গে-সঙ্গে তো আর চাকরি পাবে না', বাবা জবাব দিত।

'তা হোক,' রাকা বলেছিল, 'আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। আমার ইচ্ছে আরো পড়াশোনা করার।'

অমিতাভ কোনোদিন ছেলেমেয়েদের অনিচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছাকে চাপাতে চান নি। শুধু বলে-ছিলেন, 'বিয়ের পরেও তো পড়াশোনা করা যায়।'

রাকা হাসতে-হাসতে বলেছিল, 'যায় যদি প্রভু সদয় হন তবেই। প্রভুর ইচ্ছে থাকলেও গুরুজনেরা চান না। তুমিতাকে তোমার মনে আছে ? কত ভালো মেয়ে ছিল। উচ্চ মাধ্যমিকের পর বিয়ে হয়ে গেছল। ওর কত ইচ্ছে ছিল বি. এ. পড়ার। শ্বশুর-শাশুড়ি আপত্তি করায় হল না। ওর বরও সুবোধ বালকের মতো মা-বাবার অবাধ্য হতে পারে নি। তুমিতার অত ভালো কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে গেল।'

আসলে বড়ো মেয়ে রিঙ্কুর বিয়ের ব্যাপারে অমিতাভকে চরম অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে বলে রাকার ব্যাপারে সতর্ক। সম্বন্ধ করে ভালোমতন বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হন। দেবজিৎ আর রিঙ্কুর মেলামেশাকে সহজভাবে নিয়েছিলেন। জানতেন না ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছল। রিঙ্কুর যখন ফার্স্ট ইয়ার, দেবজিৎ তখন থার্ড ইয়ারে। রাকার ভাষায় 'এনগেজমেনট' নাকি তখনি হয়ে গেছল। দেবজিৎ প্রায়ই ওঁদের বাড়ি আসত। চেহারায় চটক থাকলেও সিনিয়ার কলেজ-বন্ধু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি ওঁরা। যেদিন রিঙ্কু ওর মনের ইচ্ছে প্রকাশ করে-ছিল, চমকে গেছলেন অমিতাভ। এও কি সম্ভব ? দেবজিৎ বেকার, তা ছাড়া স্বজাতের নয়। রিঙ্কুকে অনেক বুঝিয়েও ওঁরা ফেরাতে পারেন নি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে সোজা দেবজিৎদের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল। থানা-পুলিশ করেও কিছু হয় নি। শেষমেশ ওদের বিয়েতে মত দিতে হয়েছিল অমিতাভকে। বিয়ের পর দু বছর রিঙ্কুর সঙ্গে এ বাড়ির কোনো সম্পর্কই ছিল না। মায়া লুকিয়ে চোখের জল ফেলতেন। অমিতাভ বাইরে একটা উদাসীন ভাব দেখালেও ভেতরে-ভেতরে চাইছিলেন

মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে। দেবজিৎ তখন সেলস-রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরি করছে। উপলক্ষ এসে গেল। বেয়াইমশায়ের চিঠিতে জানলেন অমিতাভ রিঙ্কুর বাচ্চা হবে। মুহূর্তে রাগ অভিমান জল হয়ে গেল। অমিতাভ নিজেই একদিন রিঙ্কুকে নিয়ে এলেন। দেবজিৎও এল। সহজ হয়ে গেল সবকিছু। এখন প্রতি সপ্তায় অন্তত একবার নাতনি মউকে দেখে না এলে অস্থির হয়ে পড়েন। প্রায়ই ওরা আসে। হইহুল্লোড়ে সেদিন বাড়িটা যেন প্রজাপতির মতো পাখনা মেলে উড়তে থাকে।

মায়া বলেন, 'যাই বল, ওদের মিলমিশ খুব। শ্বশুর তো বউমা বলতে অজ্ঞান। রিঙ্কু বলছিল শ্বশুরের নাকি কড়া হুকুম ওকে সবার আগে খেয়ে নিতে হবে। বলেন, 'ছেলেমানুষ বয়েস।' বেলা করে খেলে কি শরীর ভালো থাকে? নিয়মকানুন না মানার জন্যেই তো আমাদের দেশের মেয়েদের নানান রোগে ধরে।'

অমিতাভ মুচকি হেসে বলেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে জাতটাত না মেনে ঠিকুজি কোষ্ঠী না মিলিয়ে বিয়ে হওয়াতে ভালোই হয়েছে।'

'একশোবার', মায়া জোর দিয়ে বলেন, 'মনের মিল হল আসল রাজযোটক। মনে-মনে মিল হলে গ্রহনক্ষত্ররাও দলে চলে আসে।'

অমিতাভ কপট গাম্ভীর্যে বলেন, 'কিন্তু তোমার আমার যে জন্মছক মিলিয়ে যোটক বিচার করে বিয়ে হয়েছিল, সেটা তাহলে ঠিক হয় নি?'

মায়া হাসেন। 'সে তুমি ভালো করেই জান। শুনেছিলুম আমাকে দেখে যাবার পর তোমার নাকি এমন অবস্থা হয়েছিল যে জন্মছক না মিললেও বিয়ে করতে।'

কথাটা ঠিক। এই বয়েসেও মায়ার দেহের বাঁধুনি আর রূপ চোখ টানে। রাস্তায় হেঁটে গেলে অনেকেই তাকায়।

অমিতাভ রিটায়ারমেনটের নোটিশ পেয়েছিলেন একবছর আগে। তারও বছর দুই আগে অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে সলট লেকে জমি দেখতে গেছলেন। অমিতাভ ছাড়া ওঁরা কয়েকজন জমি কিনেছিলেন। দুজনের বাড়িও শেষ। আসলে অমিতাভ কোনোরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। হাওড়ায় পৈতৃক বাড়িতে মাথা গোঁজার মতো দুখানা ঘর পাবেন। কী দরকার ধার-দেনা করে বাড়ি তৈরি করা? বরং সেই টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে আয় দেবে। তা ছাড়া সোমের পড়াশোনা আর রাকার বিয়ে এখনো বাকি। কিন্তু মায়ার কাছে ওইসব যুক্তি অর্থহীন। বলেছিলেন, 'এখন তোমাদের ভাইদের মধ্যে যে ভালোবাসা রয়েছে তা কি একসঙ্গে থাকলে থাকবে? খুব কাছাকাছি এলে সম্পর্কে চিড় ধরে। হয় লাঠালাঠি নয়তো শান্তিপূর্ণভাবে পাঁচিল ওঠে। দূরে থাকলেই সম্পর্ক ভালো থাকে।'

মায়ার কথাটা অমিতাভ উড়িয়ে দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর তূণে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। জমি কিনে বাড়ি করা মানে নিঃস্ব হয়ে পড়া। ধার করলেও আজ না হোক, কাল তো শোধ করতে হবে। কোথা থেকে কিভাবে টাকা আসবে তা তাঁর জানা নেই। প্রতি মাসে সোমকে মোটা টাকা দিতে হয়। বাজার-দর আগুন হওয়ায় "ব্যয়সঙ্কোচ" কথাটাই অসার হয়ে দাঁড়িয়েছে আগে ভাতের পাতে মাছ না হলে কারোর খাওয়া হত না, এখন হপ্তায় একদিন কি দুদিন মাছ এলে যথেষ্ট মনে হয়। কিছুদিন আগে ম্যাগাজিন আর খবরের কাগজ মিলিয়ে বিল হত দেড় শ টাকা, এখন অনেক কাটছাঁট করে সত্তর টাকায় দাঁড় করিয়েছেন। গোয়ালার বিলও কমিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যয়সঙ্কোচের অস্ত্র প্রয়োগ করেও মূল্যবৃদ্ধির দৈত্যকে ঘায়েল করতে পারেন নি।

অমিতাভ বাড়তি টাকা রোজগারের জন্য ভাবেন নি তা নয়। কিন্তু ব্যাবসা-ট্যাবসা তাঁর দ্বারা হবে না।

পরিশ্রম বা ঝুঁকি কোনোটাই তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব না। একমাত্র যা সহজ, যে রাস্তায় যে-কেউ হাঁটতে পারে তা হল টিউশনি। কবে কোন্ কালে পাঠ্য বইয়ের জগতে ঘুরে বেড়িয়েছেন সে সময়কার অভিজ্ঞতা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবু এখনো চর্চা করলে আয়ত্তে আনা যায়। হায়ার সেকেনডারি সায়েন্সের কিছু ছাত্র ছাত্রী জুটে গেল। অফিসের ছুটির পর বাড়ি ফিরে বসতেন। প্রথম-প্রথম অস্বস্তি হত। অনভ্যাসের ব্যাপার ছাড়াও কেমন যেন মনে হত টাকা রোজগারের জন্যে নিজেকে 'খেলো' করে ফেলেছেন। উঞ্ছবৃত্তি কথাটা অরুচিকর হলেও ঠিক। এখন চারপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং ক্লাস, টিউটোরিয়াল হোম গজিয়ে উঠেছে। ভালো রেজাল্ট দূরের কথা, পাশ করার জন্যে দরকার কোচিঙ অথবা নোটস। উর্বর এই অর্থকরী ব্যাবসায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে যোগ্য-অযোগ্য সবাই। সুতরাং টিউশনি ব্যাপারটায় আর কোনো অপরাধবোধ কাজ করে না।

রিটায়ারমেনটের দিন যত এগিয়ে আসছে, অমিতাভ ততই অনিদ্রারোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। আজকাল আর বিছানায় শুয়েই ঘুম আসতে চায় না। এপাশ-ওপাশ করেন। মায়া তখন নিবিড় ঘুমে। ঈর্ষা হয় মায়াকে। মায়া কি ওঁর মতো সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন না? নাকি ভাবনা অর্থহীন বলেই ঘুমের শান্তিতে তলিয়ে যেতে চান? ঘড়ির অবিরাম টিকটিক শব্দ কানে আসে। কে যেন হেঁটে যাচ্ছে! কে? সময় নাকি? চিত হয়ে শুয়ে নাইলনের মশারির সবুজ জালের মধ্য দিয়ে নীলাভ জিরো আলোয় অমিতাভ তাকিয়ে থাকেন সিলিঙের দিকে। একটা ছাদ, ছাদের নীচে দুটি ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে ওঁরা মা-বাবা। সোম রাত্রে এসেছে, কাল ভোরে হোস্টেলে ফিরে যাবে। সারাদিন কোথাও যায় নি, কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাও করে নি। সারাক্ষণ বাবা-মা-বোনের সঙ্গে গল্প। গল্প আর গল্প। হোস্টেলের নানান ঘটনার। রাকার কর্মপিউটার নিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছের পিছনে সোমের ইন্ধন অবশ্যই আছে। সোম বলেছে, 'বাবা, রাকার ব্যাপারে যা করবার আমি করব। তোমায় কিছু করতে হবে না। বেহালায় ছোটোমাসির সঙ্গে কথা বলেছি। কলকাতায় ভরতি হলে রাকা ওখানে থাকবে। ক্লাস করার সুবিধে। তা ছাড়া মাসি আর বোনেরা খুব খুশি হবে।'

একেকটা রাত এমনি যায়। কী দ্রুত ফুরিয়ে আসে রাত। রাত ফুরোলেই দিন। দিন ছোটে পাগলা ঘোড়ার মতো। পৃথিবীর আহ্নিক গতি কি বেড়ে গেছে? খুব তাড়াতাড়ি ক্যালেনডারের তারিখ-বদল হচ্ছে। অমিতাভর মনে পড়ে যেন এই সেদিন এখানে এলেন চাকরি নিয়ে। এক শীতের রাতে ট্রেন থেকে নেমেছিলেন স্টেশনে। খুব জমপেশ শীত পড়েছিল সেদিন। ট্রেন থেকে নামবার সময় শীতে কাঁপছিলেন অমিতাভ। সেদিন তিনি যুবক। সঙ্গে একটা বেডিঙ, সুটকেশ আর কাঁধে সাইডব্যাগ। কুলটির লোহার কারখানায় চাকরি নিয়ে এসেছেন। কোথায় উঠবেন কিছুই ঠিক নেই। এর আগে ইনটারভিউ দিতে এসে শুনেছিলেন এখানে নাকি কয়েকটা মেসবাড়ি আছে যেখানে ব্যাচেলারদের সিট পাওয়া যায়। খুঁজলে বাড়িও পাওয়া যাবে ভাড়া নেওয়ার জন্যে।

দেখতে-দেখতে কত বছর পেরিয়ে গেল। নতুন জায়গা, নতুন জীবন, নতুন বন্ধুবান্ধব। এর আগে কখনো বাড়ি ছেড়ে থাকতে হয় নি। হবে বলে ভাবেন নি। নিজেকে কেমন নির্বাসিত বলে মনে হত। শনিবার হলেই ট্রেন ধরে হাওড়া যেতেন, সোমবারে ফিরতেন। ফিরেই আবার অপেক্ষা, কবে শনিবার আসবে। এই প্রতীক্ষার ব্যাপার নিয়ে ওঁদের ৩৬নং মেসবাড়ির এক তরুণ একবার একটি কবিতা লিখেছিল। কবিতাটি কাঁচা হাতের হলেও মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রবাসজীবনের ব্যথা যেন মোচড় দিয়ে উঠত সেই অকবিতার শব্দে-শব্দে। 'শনিবার, শনিবার, এসো তুমি বারবার, / পাপিষ্ঠ সোমবার আসিও

না আর।'

বিয়ের এক বছর পরে মায়াকে নিয়ে এলেন কুলটিতে। কোয়ার্টার পান নি। বাসা ভাড়া করলেন। দু-কামরার বাড়ি। রাস্তার কল থেকে জল তুলতে হয়। প্রায়ই লোডশেডিঙ, তবু যেন অমিতাভর মনে হত তিনি স্বপ্নের দেশের ঠিকানা পেয়ে গেছেন। ওঁর আর মায়ার স্বপ্ন, ইচ্ছা আর কামনা ক্রমে ডালপালা-লতা ছড়িয়ে যেন একটা মহীরুহ হয়ে উঠেছিল। পুরন্ত সংসার। রিঙ্কু, রাকা আর সোমকে নিয়ে ওঁদের কত কল্পনা।

অমিতাভ এখন বুঝতে পারেন, মানুষ না, মানুষের কল্পনাও না, আসল ম্যাজিসিয়ান হল সময়। সময় যেন ভেলকি দেখাচ্ছে। 'এই দেখছ আমার দু হাত ফাঁকা, কিছুই নেই, এক থেকে তিন গোনো, কী দেখছ এখন? হা হা, ছুটো আপেল। সত্যি আপেল, যে কেউ এসে একটা কামড় দিয়ে দেখতে পার, স্বাদ গন্ধ সব পাবে। আচ্ছা, আবার এক থেকে তিন গোনো। ছুঁ মন্তরে এই আপেল ছুটো উড়িয়ে দিচ্ছি। কী, আর আপেল আছে? নেই। এই দেখুন দু হাত। আপেলের ডানা গজিয়ে যেতে উড়ে গেছে। আবার ফিরিয়ে আনছি। আয় আয় আয়···। জাদুকর দু হাত ওপরে তুলে যাদের ডাকছে তারা এবার এল। না আপেল না, একজোড়া হাঁস। তারপরই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে হাঁসের বদলে দু হাতে একজোড়া করে চারটি ডিম।'

তখন স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়তেন অমিতাভ। একবার এক জাদুকর মিস্টার সরকার এসেছিলেন জাদুবিদ্যা দেখাতে। মাথায় রাজার মতো মুকুট, তেমনি ঝলমলে জরির পোশাক। ম্যাজিক দেখতে-দেখতে কিশোর অমিতাভ যেন স্বপ্নের দেশে চলে গেছলেন। যেখানে চমক আর বিস্ময় যেন পথেঘাটে ছড়ানো। সোনা, হীরে কি দামি পাথরের মতো।

এখন অমিতাভ সময়ের সেই আশ্চর্য জাদুকরকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। নিস্পন্দ মুহূর্তগুলি যেন জেগে উঠছে সেই জাদুর খেলায়। মনে পড়ছে চৌধুরীবাবুর কথাটা। 'চাকরির শেষ দিনে আমার তো মশায় ইচ্ছে করে মালিকের বিরুদ্ধে একটা মামলা ঠুকে দি। মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে।' অমিতাভর কেমন যেন মনে হয় একটা হিসেব হওয়া দরকার। কী পাওনা ছিল, কীই-বা পেলাম। বিয়োগ করলেই ধরা যায়। সাক্ষীর দরকার হয় না, প্রয়োজন অভিযোগকারীর সততা। হয়তো মহামান্য বিচারক নিজেই বুঝতে পারবেন অভিযোগের সত্যাসত্য।

গত শনিবার সোম না আসায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন মায়া। তারপর এক সপ্তা কেটে গেল, না চিঠি না খবর। সাধারণত এরকম হয় না। না আসতে পারলে খবর পাঠায়। মায়া বলছিলেন, 'মনে আছে গত বছর সোম আমাদের কীরকম ভাবিয়ে তুলেছিল? সেবারে প্রায় দিন পনেরো কোনো খবর পাই নি। তুমিও অফিসের কাজে যেতে পার নি। হঠাৎ একটি ছেলে এসে হাজির। জানা গেল, প্রোজেকটের কাজে নাকি ভীষণ ব্যস্ত। বলে পাঠিয়েছে আমরা যেন না ভাবি।'

'হয়তো এবারেও সেরকম কিছু', অমিতাভ বলেন।

রাকা বলে, 'না বাবা। আমাকে বলে গেছল, আসবে। মালঞ্চে চ্যাপলিনের বইটা দেখা হবে, কথা হয়েছিল।'

'অফিসফেরত আজই একবার যাও,' মায়া বলেন, 'যদি শরীর-টরির খারাপ হয়ে থাকে তো নিয়ে আসবে।'

'শরীর খারাপ ভাবছ কেন?'

'হতেও তো পারে, সিজন চেনজের টাইম। আগেরবার বলেছিল, বিকেলের দিকে গা গরম থাকছে। মাথা ধরে। জানই তো ছেলের স্বভাব। কিছু বলতে চায় না। শরীর খারাপ হলেও চেপে রাখে। মরে গেলেও ডাক্তারের কাছে যাবে না। তোমার ছেলে তোমার স্বভাব পেয়েছে।'

'আমার ছেলে, তোমার না?' অমিতাভ ভ্রূকুটি করেন। সূক্ষ্ম একটা অভিমান যেন টের পান মায়ার

কথায়। অমিতাভ কি মন খুলে কোনোদিন কিছু বলেন না, চেপে রাখেন?

হতে পারে। মায়াই তো সেই আয়না যাতে অমিতাভর স্বভাব-প্রকৃতির ছবি দেখা যায়। সব মানুষ সমান হয় না। হতে পারে না। জিন ফ্যাকটর ছাড়াও পরিবেশ আর পরিস্থিতি কাজ করে। অমিতাভ সেই ধরনের মানুষ যারা বেশি কথা বলার চেয়ে গভীরভাবে ভাবতে ভালোবাসে। আসলে এই জাতের মানুষেরা অন্তরমুখী হয়ে থাকে। দৃশ্যমান তরঙ্গের চেয়ে চোরাস্রোত এদের মধ্যে প্রবল। এরা কখনো শিল্পী, কখনো সাধকও হতে পারে। ভিতরকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাইরে বেরিয়ে না আসায় ভিতরেই একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরা যেমন আঘাত বা কষ্ট সহ্য করতে পারে, যেমনি কখন যে সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায় তা টের পায় না। ফলে যা ঘটবার সেই বিস্ফোরণ ঘটে। বড়ো আকারের হলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অমিতাভ অতটা উগ্র নন। সাধারণের থেকে কিছু বেশি অনুভূতিপ্রবণ। মায়া সেরকম নন।

সোমকে নিয়ে একটা গর্ব এই সাংসারের সকলের মধ্যেই আছে। সেটাই স্বাভাবিক। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে। মাধ্যমিকে সপ্তম স্থান পেয়েছিল সোম। উচ্চ-মাধ্যমিকেও ওপর দিকে জায়গা পেয়েছে। পড়াশোনায় ভালো হলেও সোমের মধ্যে অহংকার নেই, যেটা আছে সেই বিনম্র প্রকৃতির জন্যে যে-কোনো মানুষের মনোযোগ টানে। অতিকথন আর প্রচারের এই সময়ে এমন দৃষ্টান্ত খুব বিরল। দুর্গাপুরে আর. ই. কলেজে ভরতি হওয়ার পর প্রতি সেমিস্টারে দুর্দান্ত ভালো ফল করেছে। অধ্যাপকেরা আশান্বিত। ওঁদের বিশ্বাস ফাইন্যালে সোম মুখ রাখবে।

কিন্তু ওর স্বাস্থ্য ভালো যায় না। ওর-বয়েসি ছেলেদের তুলনায় অনেক রোগা-পাতলা চেহারা। ভোগেও খুব। মা বাবা চিন্তা করলেও সোম আদৌ ভাবে না। শরীরের ব্যাপারে যত্ন নেওয়ার কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়। হোস্টেলের খাওয়াদাওয়া সহ্য হয় না বলে মায়া বলেছেন দুধ আরো বেশি করে খেতে। অমিতাভ নিয়মিত প্রোটিনেক্স কিনে দিয়ে আসেন। কিন্তু লক্ষ করেছেন জিনিসগুলি যেমনকার তেমন পড়ে থাকে। খবর নিয়েছেন দুধও নাকি খায় না। বলে, দুধ খেলে নাকি একটা বমি-বমি ভাব আসে।

মায়া রাগ করেন। মায়ের রাগ দেখে সোম হা-হা করে হাসে। বলে, রাশিয়া-আমেরিকাও আর কোল্ড-ওয়ারের দিকে যাচ্ছে না। মা, তুমি কেন রাগ করছ? তুমি ভাব তোমার ছেলেকে আক্রমণের জন্যেই পৃথিবীর যত অসুখ-বিসুখ রেডি হয়ে আছে। আরো অনেক ছেলে আমাদের সঙ্গে থাকে। কই, তাদের মায়েরা তো তোমার মতো ভাবে না।'

'তারা তোমার মতো ভোগে না। ওদের স্বাস্থ্য অনেক ভালো।'

প্রতিবাদ করে সোম, 'কে বলেছে তোমাকে? ওদের হেলথ সার্টিফিকেট কেউ দিয়েছে?'

'না, তোর সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। তোর যা ইচ্ছে তাই কর বাপু। আমাদের আর ভাবাস না।' মায়া নাচার হয়ে বলেন।

বাচ্চা ছেলের মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে সোম। টিভির কোনো একটি বিজ্ঞাপনের আদলে মাকে আদর করে বলে, 'ও মাই সুইট মাম্মি, আই লাভ য়ু মাম্মি।'

দিনগুলি একে-একে বিদায় নিচ্ছে। অমিতাভ অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুই করার নেই। অদৃশ্য কে যেন বোতাম টিপে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। দেরি করে বিয়ে করেছিলেন, তারপর একে-একে তিন সন্তানের জন্ম। ছেলেমেয়েদের বড়ো হওয়ার ফাঁকে জলের মতো গড়িয়ে গেছে সময়। টের পান নি অমিতাভ এখন হাতে-গোনা কয়েকটা দিন। রাকার বিয়ে বাকি। সোমের পড়াশোনার পর্ব শেষ হতে

এখনো দু বছর। তারপর অনিশ্চিত ব্যাপার। অবশ্য একটা চাকরি পেয়ে গেলে সোম আরো পড়াশোনা করতে পারবে। প্রভিডেন্ট ফানড আর গ্রাচুইটির টাকা ব্যাঙ্কে ফিকসড করলে তার সুদে ভালোভাবেই কেটে যাওয়ার কথা। রাকার বিয়ের বন্দোবস্ত হলে সেই কলসীর জল গড়িয়ে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। হাওড়ার এজমালি বাড়িতে দুটো ঘর পাবেন। আরো কিছু তৈরি করে নিতে হবে। জমি কেনা থাকলে কিছুটা বিক্রি করে সেই টাকায় বাড়ি করতে পারতেন। কিন্তু মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো দূরদৃষ্টি ছিল না অমিতাভর। পরিকল্পনাহীন জীবন কেবলি স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া। এখন গতস্য শোচনা নাস্তি। ইচ্ছে করলেও চেষ্টা করলেও সেই পুরনো জায়গায় ফেরা যাবে না। স্রোতের টানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব না।

সোমের হোস্টেলে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। হোস্টেল প্রায় ফাঁকা। ক্যামপাসে একটি চেনা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নাম মনে পড়ছে না, সোমের সহপাঠী। সোমের কথা জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'ও রুমেই আছে। ওর শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না।'

'কেন কী হয়েছে? জ্বরটর?' উদ্বিগ্ন হলেন অমিতাভ।

'না, সেরকম কিছু না', ছেলেটা ঢোঁক গিলে বলল। 'উইকনেস আর কী। বাড়িতে খবর দিতে ওই বারণ করেছে। সুপারকেও জানায় নি।'

'উইকনেস! উইকনেস কেন?' অমিতাভ সোজা-সুজি ছেলেটির দিকে তাকালেন। 'আমার কাছে লুকোতে চাইছ। সত্যি করে বলবে কী হয়েছে?'

'চলুন না, দেখলেই বুঝতে পারবেন,' বলে ছেলেটি সিঁড়িতে দু ধাপ উঠে গেল। অমিতাভ ওর পিছনে উঠতে শুরু করলেন।

এখানে কতবার এসেছেন। কখনো এরকম দুশ্চিন্তা হয় নি। সিঁড়ির ধাপে-ধাপে উঠতে-উঠতে অমিতাভ যেন নিজের হৃৎপিণ্ডের বেজে-ওঠা শুনছিলেন। যেন পাশাপাশি দুজন, অমিতাভ চক্রবর্তী নামে পরিণত বয়েসের এক ধীরস্থির প্রকৃতির ভদ্রলোক আর তাঁর পাশাপাশি কায়াহীন উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার প্রেতাত্মা।

সোম ওর খাটে শুয়ে ছিল। ছেলেটি ওকে ডাকল। সোম উঠে বসল।

'বাবা, তুমি?'

'কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ? গত শনিবার তো গেলি না। খবর-টবর দিস নি। তোর মা ভীষণ ভাবছে।'

কপালে হাত ছোঁয়ালেন অমিতাভ। সোম মাথা নীচু করল।

'জ্বরটর তো নেই। মাথা ধরেছে?'

সোম মাথা নাড়ল।

ছেলেটি বলল, 'কিছু ভাববেন না কাকাবাবু। ও ঠিক আছে। রাত জাগার জন্যে হয়তো স্ট্রেন পড়েছে।'

'তোকে আমরা রাত জেগে পড়তে বারণ করেছিলাম,' অমিতাভ বলেন, 'তোর মা প্রতিবারই তোকে বলে। এভাবে শরীরের ক্ষতি করে পড়াশোনা করে লাভ কী?'

সোম মাথা নীচু করে ঝিমোচ্ছিল। জবাব দিল না। ছেলেটি বলল, 'কাকু, একবার বাইরে আসবেন? কথা আছে।'

অমিতাভর উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছিল। সোমের দিকে তাকিয়ে উঠলেন। ঘরের বাইরে এলেন। করিডরটা নির্জন। ছেলেটি বলল, 'কাকাবাবু, আপনাকে বলি নি। কী রিঅ্যাকশান হবে না জেনে···।'

অমিতাভ যেন ধৈর্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েছেন। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, 'কী হয়েছে ওর সেটা বলবে তো?' ছেলেটি বলল, 'সুপার জানে না। এই হোস্টেলের চারজন ড্রাগ অ্যাডিকট হয়ে পড়েছে। সোমকে নিয়ে আমরা গেছলাম ডাক্তার সেনের কাছে। উনি দেখেছেন, ওষুধপত্র দিয়েছেন। বলেছেন,

এখন প্রাইমারি স্টেজ। সেরকম সিরিয়াস কিছু না। যাতে আর ড্রাগ নিতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বাইরের কয়েকটি ছেলে এই হোস্টেলে আসত। ওরাই লুকিয়ে সাপ্লাই করত। জানাজানি হবার পর আমরা কড়া নজর রেখেছি যাতে ওরা ঢুকতে না পারে।'

'সুপারকে জানাও নি কেন?'

'উনি জানতে পারলে ওদেরই শাস্তি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। তাতে অনেক ক্ষতি হয়ে যেত।'

বজ্রাহতের মতো হয়ে গেছলেন অমিতাভ। শেষ পর্যন্ত সোম, ওঁদের নয়নের মণি, সে-ও এভাবে শিকার হবে। মারাত্মক নেশায় জড়িয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। এখনো সেটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। খবরের কাগজে পড়েছেন, অনেক শুনেছেন। যারা একবার নেশায় জড়িয়ে যায় তারা সেই মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে দিনের পর দিন এক বোধহীন স্মৃতিহীন অন্ধ জড়ত্বের দিকে এগিয়ে যায়। দুনিয়ার সেই যাত্রাপথ, যেখান থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসার ঘটনা খুব কম।

কিন্তু সোম কেন এ কাজ করল? নৈরাশ্য আর অবসাদের জালে কিভাবে নিজেকে জড়াল? এর আগের বার যখন বাড়ি এসেছিল তখন তো বোঝা যায় নি। নাকি ওই বিষ অনেক আগেই ঢুকেছে, তিলে-তিলে গ্রাস করেছে চেতনাকে?

এখন কী করবেন অমিতাভ? অবশ্যই ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া উচিত। যেতে না চাইলেও নিয়ে যাবেন। ভালো করে চিকিৎসা দরকার, বিশ্রাম-ও।

অচিন্ত্য, মানে সেই ছেলেটি বলল, 'কাকাবাবু আপনি সুপারকে ওর জ্বর হয়েছে রিপোর্ট করে বাড়ি নিয়ে যান। চিন্তা করবেন না, ভালো হয়ে যাবে।'

সোমকে নিয়ে ট্যাকসিতে ফিরছিলেন অমিতাভ।

দুর্গাপুর থেকে কুলটি অনেকটা রাস্তা। দু পাশে অন্ধকারে ফুটে উঠেছে আলোর ফুল। অন্ধকারই বোধহয় আলোর ফুলফোটার উপযুক্ত পরিবেশ।

হু-হু করে বাতাস আসছে জানলা দিয়ে। অমিতাভ ড্রাইভারকে বললেন, 'একটু আস্তে চালাও ভাই।' ট্রাফিক আইন এমনিতে কেউ মানে না। তারপর ফাঁকা রাস্তায় রাত্রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ভারী ট্রাকগুলো। যে-কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

দুর্ঘটনা কি ঘটে নি? নিজের মনেই প্রশ্ন করেন অমিতাভ। তাঁর পাশে সিটে আধশোয়া অবস্থায় সোম। সারাক্ষণ চুপ হয়ে আছে। শুধু হোস্টেল থেকে বেরুনোর সময় জিজ্ঞেস করেছিস, 'আমাকে কি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, অনেক দিন যাও নি। তোমার মা নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'ও', বলে ঝিমিয়ে পড়েছিল সোম।

জনপদ পেরিয়ে কোথাও দিগন্তবিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। হেডগীয়ার চোখে পড়ে। মাটির নীচে কয়লার কালো শহরে এখন কর্মব্যস্ততা। ডিনামাইটে কয়লার চাঙড় ফাটানো হচ্ছে। ট্রলি লাইনে কয়লা বোঝাই হচ্ছে গাড়িতে। কোথাও সেফ-টি-ল্যাম্পের আলো পরখ করে নিচ্ছে জমা গ্যাস। ভিতরে এত কাণ্ডকারখানা, অথচ বাইরে তার প্রকাশ নেই।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় চৌধুরীবাবুর কথা। উনি মামলা করতে চান ক্ষতিপূরণ চেয়ে। জীবনের কত মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ বিনিময়ে প্রাপ্তি যৎসামান্যই। 'কী পেয়েছি বলুন? আপনিই বা কী পেয়েছেন?'

যোগ্য জবাব খুঁজে পান নি অমিতাভ। তাঁর জানা নেই। এই যে আজ তাঁর আর মায়ার শ্রেষ্ঠ স্বপ্নকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নিয়ে ফিরছেন, তার কষ্ট কাকে জানাবেন? কিভাবে তিনি প্রকাশ করবেন ভিতরকার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাকে?

অস্তিত্বে কলকাতা : বাঙলা উপন্যাস

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

এক

'হে পদ্মা আমার, / তোমায় আমায় দেখা শত শত বার': পদ্মাপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ যেমন একথা বলেছেন, তেমনি নবজাগ্রত বাঙালি আর ভারতের শিক্ষিত আর উচ্চাশীমাত্রেই মনে-মনে একথা বলেন, 'হে কলকাতা আমার, তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।' কলকাতা পাঁচ শ বছর পূর্বে ছিল একটি গ্রাম, পরবর্তী কালে তা হয়ে উঠল শহর, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের হৃৎপিণ্ড। তার ধমনীতে প্রবাহিত হল সারা দেশের শোণিতস্রোত। তার হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত হল সারা দেশের প্রাণ।

বাঙলা গল্প-উপন্যাসে সে কারণে কলকাতার এত সমাদর। আসক্তি ঘৃণা বিরাগ তাচ্ছিল্য উপেক্ষা—সবকিছু দিয়েই আমরা কলকাতাকে আমাদের অস্তিত্বে স্বীকার করে নিয়েছি। কলকাতা বঙ্গীয় সমাজে অনন্য অদ্বিতীয়, যেমন মার্কিন দেশে ন্যু-ইয়র্ক। শেষোক্তের প্রশস্তি করেছেন অনেক মার্কিন লেখক। কলকাতার বন্দনা করেছেন বাঙালি লেখক। বাঙলা গল্প-উপন্যাসে চরিত্রের অস্তিত্বে মিশে আছে কলকাতা—যেমন আছে সাধারণ বাঙালির জীবনে। কলকাতা আজ পর্যন্ত ভারতীয় বাঙালির জীবনে দ্বিতীয়রহিত স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশের জীবনে ঢাকার পাশে সমমর্যাদায় আছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম। উত্তর-প্রদেশের লখনউর পাশাপাশি মাথা তুলে আছে বারাণসী, আলিগড়, এলাহাবাদ। বিহারে পাটনার প্রতিদ্বন্দ্বী রাঁচি, ভাগলপুর, জামশেদপুর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার কাছাকাছি কেউ নয়। কলকাতার এই অনন্যতার প্রতিফলন ঘটেছে বাঙলা গল্প-উপন্যাসে, সৃষ্ট চরিত্রদের অস্তিত্বকে গ্রাস করে আছে কলকাতা। মুর্শিদাবাদ বা হাওড়া, বহরমপুর বা শান্তিনিকেতন, চুঁচুড়া বা কোচবিহার, জলপাই-গুড়ি বা মেদিনীপুর, নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর কলকাতার পাশে দাঁড়াতেই পারে না। এর ফল সবটাই শুভ

নয়, একথা মেনে নিয়েও স্বীকার করতে হয়—কলকাতার পাশে কেউ নয়। ভারতীয় বাঙালিমাত্রেই যেমন কলকাতায় একটা আস্তানা গাড়তে চান, তেমনি গল্প-উপন্যাসের নায়কনায়িকামাত্রেই কলকাতায় আসতে চায়। হয়তো সবটাই ভালোবাসা নয়, ঘৃণা-বিরাগও আছে, তবু কলকাতাকেই তারা চায়।

স্বীকার্য, শহর কলকাতা একদিনে এই অনন্যতায় উপনীত হয় নি, হতে সময় লেগেছে। কিন্তু কলকাতার প্রতিষ্ঠাকে কোনো ঘটনাই রোধ করতে পারে নি। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে (১৮৯৮) কলকাতায় প্লেগের মড়ক দেখা দিয়েছে, দলে-দলে লোক পালিয়েছে; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বোমার ভয়ে লোকে দিকবিদিকজ্ঞান হারিয়ে পালিয়েছে; ডেঙ্গুজ্বরের ভয়ে দৌড় মেরেছে। সবই সত্যি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই ফিরে এসেছে। ইদানীং যত দুর্যোগই ঘটুক, কি রাজনৈতিক, কি প্রাকৃতিক, লোকে আর পালাবার কথা ভাবেই না। উলটে আস্তানা গাড়তে চায়। কি শিলচর, কি আগরতলা, কি মেদিনীপুর, কি মাথাভাঙা—যেখান থেকেই আসুক, চাই কলকাতায় স্থায়ী আস্তানা।

মধ্যযুগের অন্ধ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ইউরোপীয় সভ্যতা নবযুগে পদার্পণ করেছে যে তিন প্রধান সংঘটনের মধ্য দিয়ে, সেগুলি এক দেশে ঘটে নি, ইউরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ঘটেছে। ইতালির রেনেসাঁস, জার্মানির রিফরমেশন আর ফ্রান্সের রিভলিউশন—এই তিন সংঘটনের প্রবল ধাক্কায় মধ্যযুগের পাষাণ-প্রাচীর ভেঙে গেছে। ভারতবর্ষ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এসে উপনীত হয়েছে গত শতাব্দে। ভারতের রেনেসাঁস, রিফরমেশন আর রিভলিউশন ঘটেছে কলকাতাতেই। অবশ্য শেষোক্ত সংঘটন সম্পর্কে আপত্তি থাকতেই পারে। যদি আমরা স্বীকার করি তা এখনো ঘটে নি, বিশ্বাস করা অমূলক হবে না, তা ঘটবে কলকাতাতেই, বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সাম্যতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম মঞ্চটি এখানেই উচ্চারিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী কলকাতাকেই আধুনিক ভারতের চিন্তাবিপ্লবের পীঠভূমি বলে মনে করেছিলেন। তার প্রমাণ এই উক্তি :

> ভারতবর্ষের আর কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিম-চন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনো মানুষ তদনুরূপ পারে নি। (বাঙালি পেট্রিয়টিজম্)

পঁচাশি বছর পূর্বে প্রমথ চৌধুরী একথা লিখেছিলেন। আজ ভারতের অবস্থা বদলেছে। ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সব রাজ্যেই অগ্রসর হয়েছে, আত্মসাৎ করেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষা। কিন্তু মূল কথাটার বদল হয় নি। কলকাতা ভারতের চিত্তক্ষেত্রে মুক্তির পাদপীঠ।

সে মুক্তির ছাপ পড়েছে বাঙলা গল্প-উপন্যাসে। তাই নায়ক-নায়িকার অস্তিত্বে কলকাতার কদর অসামান্য।

এই স্বীকৃতি সব সময়েই অনুরক্তিতে নয়, বিরাগেও। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা গ্রামেই বাস করত, ব্যতিক্রম নগেন্দ্র-ভগিনী কমলমণি ও ভগিনীপতি শ্রীশচন্দ্র। তথাপি নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী কলকাতাকে অস্বীকার করতে পারে নি। কলকাতার প্রতি বিরাগে তার প্রমাণ পাই। সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে লিখেছিল, 'কলিকাতায় বিলম্ব করিও না। কলিকাতায় না কি ছয়মাস থাকিলে মনুষ্য ভেড়া হয়' (১/৫)। "বিষবৃক্ষ", "ইন্দিরা" আর "রজনী" উপন্যাসে কলকাতা এসেছে, চলে গেছে, কোনো ছাপ

রেখে যায় নি।

দুই

কলকাতার প্রগাঢ় ছাপ পড়েছে রবীন্দ্র-উপন্যাসে ছোটোগল্পে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সামাজিক উপন্যাস "চোখের বালি"-র মূল পটভূমি কলকাতা। কাশী, এলাহাবাদ, বারাসাতের গ্রাম এসেছে বটে, কিন্তু তার কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু কলকাতা প্রধান চরিত্রগুলির অস্তিত্বে প্রবেশ করেছে, একথা বলা যায় না। তবে ব্যক্তিচরিত্রের আবেগ প্রকাশের পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

> ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, তখন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মশারি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে আসিয়া দেখিল, গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না-রাত্রি বড়ো রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রকাণ্ড নিঃশব্দতা এবং সুপ্তি যেন স্তব্ধ সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় স্পর্শগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে—অসংখ্য হর্ম্যশ্রেণীর উপর দিয়া মহানগরীর নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়া বাতাস মৃদুগমনে পদচারণ করিয়া আসিতেছে। (পরিচ্ছেদ ৩২)

বিনোদিনীর জন্য মহেন্দ্রর বহুদিনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা জ্যোৎস্নামন্দির কলকাতার পটভূমে প্রকাশ পেয়েছে।

"নৌকাডুবি" উপন্যাসের শিল্পগত দুর্বলতা সর্বজন-বিদিত। প্রবল ঘটনাস্রোত চরিত্রাবলীর উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তার থেকে তাদের মুক্তি ঘটে নি। তথাপি মনোবিশ্লেষণের পরিচয় বারবারই দেখা গেছে। আর সেক্ষেত্রে পরিবেশের নিপুণ ব্যবহার অনায়াসলক্ষণীয়। পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা—মৃন্ময়নসিংহ থেকে গাজিপুর-কাশী-এলাহাবাদ। স্বীকার্য, প্রথম এই উপন্যাসেই কলকাতার চেহারা স্পষ্ট গভীর রেখায় অঙ্কিত। কলুটোলা, দরজিপাড়া এখানে দৃঢ় রেখায় চিত্রিত।

রবীন্দ্র-উপন্যাসে কলকাতা চরিত্রের অস্তিত্বে স্পষ্টভাবে হাজির হয়েছে "গোরা" উপন্যাসে। ১৮৮০-৮২ সালের ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের রাজধানী কলকাতা আর সেই সঙ্গে মফস্সল জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেদিনকার কলকাতার সাংস্কৃতিক ধর্মীয় রাজনৈতিক আর্থনীতিক চেহারা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখকের সমাজ-অস্তিত্ব, ব্যক্তি-অস্তিত্ব আর যুগ-চৈতন্যের উচ্চারণ "গোরা" উপন্যাস। কলকাতা তারই স্পষ্ট পটভূমি।

উপন্যাসের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদের সূচনায় শহর কলকাতার ছবি পাই। প্রথমটিতে ব্যস্ততার ছবি, দ্বিতীয়টিতে শ্রান্তির ছবি।

> শ্রাবণমাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কালেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁওয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এতো বড়ো এই-যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ১)

> বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণহীন বৈচিত্র্য-হীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নিচে কলিকাতা শহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মতো লেজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। কাল সন্ধ্যা হইতে টিপ-টিপ করিয়া কেবলই বর্ষণ হইয়াছে; যে বৃষ্টিতে রাস্তার মাটিকে কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার মতো বল প্রকাশ করে নাই। (পরিচ্ছেদ ২)

"গোরা" উপন্যাসের সূচনায় দুটি ছবি—'কাজের শহর কঠিন হৃদয়' কলকাতা আর 'প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মতো লেজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া' শায়িত শ্রান্ত কলকাতা। কিন্তু চরিত্রের অস্তিত্বে কলকাতার অনুপ্রবেশ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না। তার জন্যে প্রবেশ করতে হয় উপন্যাসের গভীরে। চারটি পরিচ্ছেদে সে-পরিচয় পাই।

উপন্যাস-লেখক কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তর্ক আর তর্কময় চরিত্রের চিন্তা আর অনুভূতিসমূহকে প্রাত্যহিক ঘটনা আর পরিবেশের সঙ্গে সমন্বিত করে সৃষ্টি করেছেন একটা সমগ্র ধারণার বাতাবরণ। তার ফলে চরিত্রকে তার পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ রূপে আমরা দেখি। পরেশবাবুর বাড়ির ছাদে গোরা-হারানবাবুর তর্ক যখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে তখন পরিবেশ আর পরিস্থিতি রচনায় লেখকের সতর্ক কুশলতা লক্ষণীয়। কলকাতার সান্ধ্য জীবন তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। চরিত্রগুলিকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।—

> পরেশ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হারান নিবৃত্ত হইলেন না। সূর্য অস্ত গেল; মেঘের ভিতর হইতে একটা অপরূপ আরক্ত আভায় সমস্ত আকাশ লাবণ্যময় হইয়া উঠিল; সমস্ত তর্কের কোলাহল ছাপাইয়া বিনয়ের প্রাণের ভিতরে একটা সুর বাজিতে লাগিল। পরেশ তাঁহার সায়ংকালীন উপাসনায় মন দিবার জন্য ছাত হইতে উঠিয়া বাগানের প্রান্তে একটা বড়ো চাঁপাগাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে গিয়া বসিলেন।...
>
> বাইরের ছাতে তর্ক তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। হারান তখন রাগের মাথায় গালি দিবার উপক্রম করিতেছেন। হারানের অসহিষ্ণুতায় লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া সুচরিতা গোরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। হারানের পক্ষে সেটা কিছু-মাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।
>
> আকাশে অন্ধকার এবং শ্রাবণের মেঘ ঘনাইয়া আসিল; বেলফুলের মালা হাঁকিয়া রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা চলিয়া গেল। সম্মুখের রাস্তায় কৃষ্ণ-চূড়া গাছের পল্লবপুঞ্জের মধ্যে জোনাকি জ্বলিতে লাগিল। পাশের বাড়ির পুকুরের জলের উপর একটা নিবিড় কালিমা পড়িয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ১০)

সেই সন্ধ্যায় তর্কযুদ্ধে কেউই পিছপা নয়, না গোরা, না হারান। তাদের সেই উদ্দাম তর্কের পাশা-পাশি প্রবাহিত সঞ্জীব সক্রিয় পরিপ্রেক্ষিত। গোরা-হারান তর্কে উদ্দাম, ক্রুদ্ধ, অসংযত, মারমুখী। তার পাশে কি চরিত্র কি পরিবেশ—আচার-আচরণে মনোভাব-অনুভবে সংযত। অন্যান্য চরিত্রের অন্তর্লোক, সান্ধ্য কলকাতার রাস্তার জীবনের চলমানতা, সক্রিয় পরিবেশ—সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিকতায় অন্বিত হয়েছে।

অপরদিকে লেখক গোরাকে বেদনাময় চৈতন্যের প্রেক্ষিতে অনুকূল আবেগস্পন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে তার চিত্ত-উদ্বোধনের ছবি অঙ্কন করেছেন। সেখানে নৈশ কলকাতা চরিত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে লীন হয়ে আছে। বিনয়ের প্রেমে পড়ার আশ্চর্য অনুভূতির উন্মোচনে গোরা বাধা দিতে পারে নি। শুক্লা রাতের কলকাতার অবান্তর মায়াময় পরিবেশ বিনয়কে তার প্রেমানুভূতি প্রকাশে আর গোরার উপর তার প্রতি-ক্রিয়া সঞ্চারে সাহায্য করেছে। নৈশ কলকাতা এখানে দুই বন্ধুর অস্তিত্বের অংশীদার হয়ে উঠেছে।—

> আহারান্তে দুই বন্ধু ছাতে আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিল। ভাদ্র মাস পড়িয়াছে; শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছে। হালকা পাতলা সাদা মেঘ ক্ষণিক ঘুমের ঘোরের মতো মাঝে মাঝে চাঁদকে একটুখানি ঝাপসা করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে উড়িয়া চলিতেছে। চারিদিকে

দিগন্ত পর্যন্ত নানা আয়তনের উঁচু নিচু ছাতের শ্রেণী ছায়াতে আলোতে এবং মাঝে মাঝে গাছের মাথার সঙ্গে মিশিয়া যেন সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা প্রকাণ্ড অবাস্তব খেয়ালের মতো পড়িয়া রহিয়াছে।

গির্জার ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজিল; বরফওয়ালা তাহার শেষ হাঁক হাঁকিয়া চলিয়া গেল। গাড়ির শব্দ মন্দ হইয়া আসিয়াছে। গোরাদের গলিতে জাগরণের লক্ষণ নাই। কেবল প্রতিবেশীর আস্তাবলে কাঠের মেজের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ এক-একবার শোনা যাইতেছে এবং কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিতেছে। (পরিচ্ছেদ ১৫)

এই পরিবেশেই বিনয় তার জীবনের আশ্চর্য আবির্ভাবকে একান্ত চেষ্টায় গোরার সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিল।

এই উদ্‌ঘাটনের জন্য নৈশ কলকাতার এই প্রেক্ষিত যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি গোরার মনোলোকে তার প্রতিক্রিয়া-সঞ্চারে।—

এই ছাতে এমনি নির্জন নিষুপ্ত জ্যোৎস্নারাত্রে আরও অনেকদিন দুই জনে অনেক কথা হইয়া গেছে।...কিন্তু এমন কথা ইহার পূর্বে আর কোনোদিন হয় নাই।...তাহার [গোরার] যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দা মুহূর্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এতদিনকার রুদ্ধ কক্ষে এই শরৎ-নিশীথের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল। (পরিচ্ছেদ ১৫)

গোরার অন্তর্জগতে সুচরিতার অনুপ্রবেশটি চিহ্নিত হয়ে আছে কলকাতার প্রকাণ্ড নিজস্ব নিসর্গ-পরিবেশের উপস্থিতির দ্বারা। যে রাতে সুচরিতা গোরার প্রতিটি কথা গভীর শ্রদ্ধা এবং গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে চাইল (পরিচ্ছেদ ২০) সে রাতেই গোরার অন্তর্লোকে প্রবাহিত হল নতুন স্রোত। আর তখনি কলকাতার গঙ্গাতীরবর্তী পরিবেশ গোরার চিত্তে নব অনুভূতি সৃজনে একটি বিশেষ ভূমিকা নিল।—

আজ কিন্তু নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার-দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি দীপহীন নিস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতিগ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মতো তিমির-ভেদী অনিমেষদৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর-মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমানতালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল।...

পথের ধারে সদাগরের আপিসের বাগানে কোন্ বিলাতি লতা হইতে একটা অপরিচিত ফুলের মৃদুকোমল গন্ধ গোরার ব্যাকুল হৃদয়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।...আজ এই হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। (পরিচ্ছেদ ২১)

স্বীকার্য, গোরা বা বিনয় বা সুচরিতার অস্তিত্বের অংশীদার হয়ে উঠতে পেরেছে কলকাতা, যাকে উপন্যাসসূচনায় বলা হয়েছে 'কাজের শহর কঠিনহৃদয়' আর উপমা দেওয়া হয়েছে লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের সঙ্গে।

কলকাতার বিশিষ্ট চরিত্র—বলা উচিত, উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট চরিত্র গোরা-চরিত্রের বিবর্তনে সহায়ক হয়ে উঠেছে। গোরার অস্তিত্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক অন্তর্লীন। তার চূড়ান্ত পরিচয় পাই

যাট পরিচ্ছেদে যেখানে গোরা সুচরিতা ও স্বদেশকে একটা সদর্থক বিন্দুতে মেলাতে পেরেছে এবং সে-কথা অকুণ্ঠিতভাবে সুচরিতার সামনে উচ্চারণ করতে পেরেছে। গোরার এই বক্তব্য উঠে এসেছে তার হৃদয়ের গভীর থেকে। তা শুনে সুচরিতা হয়েছে অশ্রুপ্লাবিতা, আর তা দেখে গোরার অস্তিত্ব কেঁপে উঠেছে। তার বর্ণনায় লেখক গোরার সঙ্গে কলকাতাকে বেঁধেছেন একসূত্রে।—

সুচরিতার সেই সংকোচবিহীন সংশয়বিহীন অশ্রু-ধারাপ্লাবিত দুই চক্ষুর সম্মুখে, ভূমিকম্পে পাথরের রাজপ্রাসাদ যেমন টলে তেমনি করিয়া গোরার সমস্ত প্রকৃতি যেন টলিতে লাগিল। গোরা প্রাণপণ বলে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইবার জন্য মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গলির রেখা সংকীর্ণ হইয়া যেখানে বড়ো রাস্তায় পড়িয়াছে সেখানে খোলা আকাশে কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর তারা দেখা যাইতেছে। সেই আকাশখণ্ড, সেই ক'টি তারা গোরার মনকে আজ কোথায় বহন করিয়া লইয়া গেল।...নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—সেও ওই আকাশের মতো নিস্তব্ধ, নিভৃত, অন্ধকার, এবং সেখানে জলে-ভরা দুইটি সরল সকরুণ চক্ষু নিমেষ হারাইয়া যেন অনাদিকাল হইতে অনন্তকালের দিকে তাকাইয়া আছে। (পরিচ্ছেদ ৬০)

"যোগাযোগ" উপন্যাসে শহর কলকাতার চরিত্র স্পষ্ট গভীর রেখায় অঙ্কিত। দুই মেরুলোকের অধিবাসী কুমুদিনী আর মধুসূদনের মধ্যে নেই কোনো মানসিক সম্পর্ক। মধুসূদনের কাছে কুমুর দেহের উপর অধিকার আসল অধিকার। কুমুর কাছে মনের শুদ্ধির মূল্য সীমাহীন। কুমুদিনীর অন্তর্জ্বালা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের পটভূমি এবং তার বিপন্ন অস্তিত্বের অংশ-ভাক্‌রূপে কলকাতার উপস্থিতি স্বীকার্য।

কুমুদিনীর বিপন্নতার সঙ্গী কলকাতা। বস্তুত কলকাতার প্রেক্ষাপটে কুমুর অস্তিত্বের সংকট মুদ্রিত হয়েছে। গোড়ার দিকে কুমু যখন মধুসূদনকে বিবাহে সম্মতি দিয়েছে, তখন পারিপার্শ্বিকে তার জীবনের অনিশ্চয়তার সাক্ষীরূপে হাজির কলকাতা।—

ঘরে কুমু আলো জ্বালায় নি। কাঠের সিন্দুকের উপর বসে জানালার বাইরে চেয়ে আছে। সামনে ইঁটের কলেবরওয়ালা কলকাতা আদিম কালের বর্মকঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার গায়ে গায়ে আলোকশিখার বিন্দু। কুমুর মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে। (পরিচ্ছেদ ১১)

কলকাতার এই বর্ণনা পেয়েছে সাংকেতিক তাৎপর্য। 'আদিমকালের বর্মকঠিন অতিকায় জন্তু' কুমুকে গ্রাস করার জন্য মুখব্যাদান করে আছে—এই চিত্রে কুমুর জীবনের পরিণাম আভাসিত।

আবার বিবাহ-পরবর্তী পর্বে কুমুর বিপন্নতা ব্যঞ্জিত হয়েছে কলকাতার নানা চিত্রে, কখনো তা চিমনি-উৎসারিত ধোঁয়া, কখনো তা নৈশ কলকাতার তাৎপর্যময় টুকরো-টুকরো ঘটনা।—

যে দু দিন কুমু এই ছাদে বসেছে ঐ চিমনি থেকে উৎসারিত ধূমকুণ্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিস ছিল—সমস্ত আকাশের মধ্যে ঐ কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ, কোন্ একটা আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে উঠছে।...

এই শূন্যতায় কুমুর মন ভরে ভরে উঠল। আজ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গীহীন নিঃশ্বসিত হয়ে উঠবে? (পরিচ্ছেদ ২৮)

যে রাতে কুমুদিনী যৌনক্ষুধাতাড়িত মধুসূদনের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হল, সে রাতে কুমুর অসহায়তা, বিপন্নতা, ত্রাস, পরাজয়ের অপমান ও বেদনা ব্যঞ্জিত হয়েছে সংকেতধর্মী ছবিতে। কোথাও

স্পষ্ট করে বলা নেই, কিন্তু গদ্‌গদকণ্ঠ মাতাল ও বন্দী কুকুরের ছবি দুটি কার্যত মধুসূদন ও সন্ত্রস্ত বন্দী কুমুর দিকেই ইঙ্গিত করে। সমস্ত ছবিটা নৈশ কলকাতার জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিরূপ।—

রাস্তার মোড় থেকে একটা মাতালের গদ্‌গদ কণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর প্রতিবেশীর আস্তাবলে একটা কুকুরের বাচ্চাকে বেঁধে রেখেছে—রাত্রির শান্তি ঘুলিয়ে দিয়ে উঠছে তারই অশ্রান্ত আর্তনাদ। (পরিচ্ছেদ ৩৭)

মিনিট পনেরো পরে কুমুদিনীর পরাজয় সম্পূর্ণ হল। মধুসূদন তাকে দিয়ে বলিয়ে নিল—শুতে এসো। কুমুর অপমানকর পরাভবের ঘটনাটা নৈশ কলকাতার পূর্ববৃত ছবিরই পরিণাম।—

সেই নিস্তব্ধ ঘরে আর শব্দ নেই ; রাস্তার মোড়ে সেই মাতালটার গলা শোনা যায় না ; কেবল সেই বন্দী কুকুরটা যদিও শ্রান্ত তবু মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে। (পরিচ্ছেদ ৩৭)

এইসব ক্ষেত্রে আমরা অনুধাবন করি, কলকাতা নিছক বাইরের পটভূমি নয়, তা রবীন্দ্র-রচিত চরিত্রের অস্তিত্বে প্রবেশ করেছে।

তিন

প্রমথ চৌধুরীর মতো বিদগ্ধ মার্জিত নাগরিক রুচির লেখক (আরব্যান লেখক) বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ দেখা যায় না। তাঁর কলমে শহর কলকাতা এসেছে, তবে কোনো বিশেষ রচনায় মুখ্য হয়ে ওঠে নি। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। 'আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর।' (আত্মকথা, ১৯৪৬)। শুধু কি কৃষ্ণনগর? কলকাতা কি তাঁর ভাষাকে প্রভাবিত করে নি? এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেন নি, তবে বাঙলা গদ্যভাষার আলোচনায় তার পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে। তবে তাঁর "আত্মকথা"য় শহর কলকাতার কাছে তাঁর ঋণের স্বীকৃতি-চিত্র আছে। তা এখানে উদ্ধার করি।—

আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় দুটি ব্যক্তির দর্শন-লাভের সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করি নি। সেই দুজনই ভবিষ্যতে আমার জীবন ও মন অধিকার করেন। একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। বোধহয় ১৮৮৪ খ্রী সরস্বতী পুজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণের মাঠে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণপ্রসাদ শীল সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমাকে বল্লেন যে অ্যালবার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটা বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। আর বলেন, 'চল না, রাস্তাটা পেরিয়ে অ্যালবার্ট হলে যাই।' আমি তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না, কারণ আমি শ্রান্তবোধ করছিলুম। নারায়ণ বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখে আসি চল। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।' আমি উত্তর করলুম, 'পরের বাড়ির খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।' ফলে অ্যালবার্ট হলে না গিয়ে নারায়ণ আর আমি সেই গাছতলাতেই শুয়ে থাকলুম। পরে সে মেয়েটিকেই আমি বিবাহ করি।

আশ্চর্যের কথা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্পর্কে একই কথা লিখতে হয়। তাঁর উপন্যাসেও শহর কলকাতা প্রেক্ষাপটমাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আসলে শরৎচন্দ্রের মানসিকতার মধ্যে কলকাতা প্রবেশ করে নি। "শ্রীকান্ত", "পরিণীতা", "বড়দিদি", "দেবদাস", "চরিত্রহীন", "গৃহদাহ" প্রভৃতি উপন্যাসে কলকাতার প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এসেছে অন্য প্রেক্ষাপট

এবং শহর কলকাতার সঙ্গে চরিত্রের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। আদর্শবাদী রোমানটিক হৃদয়ানুভূতি-নির্ভর এই উপন্যাসলেখকের কাছে কলকাতার বাস্তব প্রেক্ষিত ও আন্তর প্রেরণা খুব একটা জরুরি ব্যাপার বলে মনে হয় নি। শ্রীকান্ত-দেবদাস-সুরেশ-কিরণময়ী-অচলা-সাবিত্রীর সত্তার মধ্যে কলকাতা অনুপ্রবেশ করে নি।

রবীন্দ্র-পরবর্তী উপন্যাসলেখকরা কলকাতাকে চরিত্রের অংশভাক্ করে তুলতে পেরেছেন, যা শরৎ-উপন্যাসে অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে শহর কলকাতা আছে বটে, কিন্তু তা চরিত্রের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে যায় নি, যেমন হয়েছে রবীন্দ্র-উপন্যাসে।

চার

শহর কলকাতার মহৎ দান রবীন্দ্রনাথ। অনেক সময় রবীন্দ্রচর্চা হয়ে ওঠে কলকাতা-চর্চা। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের গল্প-উপন্যাসে এই জীবনসত্য মাঝে-মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। তার উদাহরণ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "যে যাই বলুক", প্রবোধকুমার সান্যালের "প্রিয় বান্ধবী"। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বুদ্ধদেব বসুর "তিথিডোর" উপন্যাস। যে-দিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল সেই বাইশে শ্রাবণ (১৯৪১) তিথিডোর-এর অন্যতম প্রেমিকযুগল সত্যেন আর স্বাতী এক স্মরণীয় শোকযাত্রার সাক্ষী ছিল। এই বর্ণনায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সেই দিনটির কলকাতা। সেইদিনই, সত্যেন আর স্বাতী পরস্পরকে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় জানল।

কলকাতার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনার স্মরণীয় বর্ণনায় সমৃদ্ধ 'তিথিডোর'।

সেই বাইশে শ্রাবণের সকালটি ছিল সুখী, সুশ্রী আর উজ্জ্বল। দুপুরেই ঘোষিত হল সেই দুঃসংবাদ তিনি আর নেই। আফিস-কাছারি ছুটি হয়ে গেল, বন্ধ হল দোকানপাট, দলে-দলে মানুষ চলেছে জোড়াসাঁকোর দিকে। মেঘলা হয়ে এল দিন, তারপর বৃষ্টি নামল।

জোড়াসাঁকোয় শেষ শয্যায় শুয়ে ছিলেন তিনি। শেষ বারের মতো কবির দেখা পাবার অনুমতি যখন মিলল তখন সত্যেন গিয়েছিল তাঁকে দেখতে।

মাথাটি মনে হলো আগের চেয়েও বড়ো, প্রকাণ্ড, কিন্তু শরীরটি একটু যেন ছোটো হয়ে গেছে, যদিও তেমনি চওড়া কবজির হাড়, তেমনি জোরালো, প্রচণ্ড আঙুল। শেষবার সে চোখ রাখলো তার চিরকালের চেনা সেই মুখের, মাথার, কপালের দিকে, মহিমার দিকে একবার হাত রাখলো হিমঠাণ্ডা পায়ে।

বৃষ্টিভেজা কলকাতার ম্লান অপরাহ্ণে আকাশ-তলে শেষবারের মতো তাঁকে দেখা গেল। সত্যেন আর স্বাতী দাঁড়িয়ে ছিল কলেজ স্ট্রিট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে। শোকার্ত মানুষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মনের উপর এক বোবা অপেক্ষার চাপ।

'আসছে……আসছে……' গুনগুন রব উঠলো ভিড়ের মধ্যে।

স্বাতী মনে-মনে ভাবছিলো লম্বা গম্ভীর আনত আচ্ছন্ন স্তব্ধ মন্থর মিছিল। কিন্তু মাত্রই কয়েকজন যেন অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এলো কাঁধে করে—নিয়ে গেলো উত্তর থেকে দক্ষিণে—পিছনে এলোমেলো অল্প লোক—বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেলো স্বাতীর চোখের সামনে দিয়ে—রোদ্দুরে ঝিলিক দিলো লম্বা শাদা চুল আর মস্ত শাদা শান্ত তন্ময় কপাল। এটুকু দেখলো, আর দেখতে পেলো না।

সত্যেন দেখলো, স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে শক্ত সোজা হয়ে। হাত মুঠ করে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা। দেখলো তার কণ্ঠের কাঁপুনি, গালের ঘন রং; দেখলো তার তরল কালো উজ্জ্বল

চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল হলো, ঝকঝকে দুটি আয়না হয়ে উঠলো, তারপর ভাঙলো আয়না, আবার তরল হলো, উপচালো, মাথা নিচু হলো।

আর তাই দেখে সত্যেনেরও নতুন করে গলা আটকালো, চোখ ঝাপসালো, আর সেজন্য লজ্জা করল নিজের কাছেই। এ-মৃত্যু তো কান্না চায় না; এই দুঃখ, এই মহান, মহাশূন্য দুঃখ, আশি বছর পরম পরিশ্রমের এই সবশেষের রত্ন—এ কি চোখের জলে বাজে-খরচ করবার।

'চলো এখন', সত্যেন কথা বললো।

সে যে কাঁদছিলো তা লুকোবার চেষ্টা করলো না স্বাতী, আঁচলে চোখ মুছলো, তাকালো একবার, একটু ভাঙা গলায় বললো, চলুন।'

তারা দুজনে কলেজ স্ট্রিট দিয়ে হাঁটছে এসপ্ল্যানেডের দিকে।

কলুটোলা পার হয়ে চিত্তরঞ্জনে এভিনিউয়ে পৌঁছতেই আকাশ কালো করে আবার বৃষ্টি নামলো একেবারে হঠাৎ। একটা পোর্টিকোর তলায় আশ্রয় নিলো তারা। ঘোর বৃষ্টি, জোর নামলো ঝমঝম, আর সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে চলে গেলো একদল শান্ত নিঃশব্দ গম্ভীর মন্থর পদক্ষেপে, প্রত্যেকের মাথা নিচু, প্রত্যেকের হাতে ফুল, প্রত্যেকের খালি পা। (তিথিডোর)

সেদিন সারা কলকাতা যোগ দিয়েছিল শেষ যাত্রায়। উপন্যাসে সেদিনকার কলকাতা হয়ে উঠেছিল একটি জীবন্ত চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যেদিন এই মর্তকায়ায় রব না, তখন যদি আমায় স্মরণ কর তবে এসো সেখানে যেখানে চৈত্রের শালবন ছায়া দেয়। সেদিনকার কলকাতা তা পারে নি। বৃষ্টিভেজা নরম হাওয়ায় বিকেল বাঁকা হলদে রোদে কবিকে শেষ বিদায় জানিয়েছিল কলকাতা। তিথিডোর উপন্যাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

এই ধরনের আর-এক স্মরণীয় শোকযাত্রার বর্ণনা পাই গৌরকিশোর ঘোষের "জল পড়ে পাতা নড়ে" উপন্যাসে—দার্জিলিঙ থেকে এসে পৌঁছল দেশবন্ধুর চিত্তরঞ্জন দাশের শবদেহ। শিয়ালদহ স্টেশনে বিশাল সমাবেশে তা গ্রহণ করলেন মহাত্মা গান্ধি, শুরু হল এক শোকযাত্রা। কিন্তু তা উপন্যাসে অনুস্যূত হয়নি, চরিত্রের অস্তিত্বের মধ্যে সেই শোকযাত্রা তথা শোকস্তব্ধ কলকাতা প্রবেশ করে নি।

পাঁচ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শহরতলী" আর "শহরবাসের ইতিকথা" উপন্যাসে কলকাতা শহরের অস্তিত্ব প্রবল হয়ে উঠেছে। "শহরতলী"তে জীবনের বিকার নয়, সুস্থ অঙ্গীকারের ছবি। কয়েকটি কারখানার মালিক উদ্যোগপতি সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী অন্যতম প্রধান চরিত্র। শহুরে মানুষের চারিত্রিক লক্ষণগুলি সত্যপ্রিয়ের মধ্যে দেখা যায়। সে নির্মম বুদ্ধিমান ধৈর্যশীল প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে জানে কিভাবে শোষণ করতে হয়। অপরদিকে শোষিত মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি যশোদা। সে তার অশিক্ষিত মন নিয়ে মালিকের শোষণ বিচার করে। কিন্তু শ্রমিকনেতার ভাষণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে অনুধাবন করে, শ্রমিক আর শ্রমিকনেতার চিন্তার মধ্যে নেই কোনো মমতা বা যোগাযোগ। এ উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে পরিবেশ। ধনী গরিব, বিজলি বাতি তেলের বাতি, বস্তির নোঙরা পথ ট্রামলাইন, রুচি অরুচি, পরিচ্ছন্নতা নোংরামি এখানে পাশাপাশি আছে। এই পরিবেশে মানুষও বিচিত্র। বড়োলোক ছোটোলোক ভদ্রলোক। এদের জীবনে পড়েছে শহুরে প্রভাব। কাছাকাছি থাকলেও এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। স্বার্থ সন্দেহ সংশয় ঈর্ষা ইতরতা নোংরামি এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শহরতলীর গরিব ও মধ্যবিত্ত চরিত্রের যাবতীয় দুর্বলতা ত্রুটি রূপায়িত।

"শহরবাসের ইতিকথা" উপন্যাসের নায়ক এসেছে

গ্রাম থেকে শহরে। এই শহর কলকাতা কিভাবে গ্রামের মানুষকে বদলে দিচ্ছে, তার প্রায় নিখুঁত ছবি এখানে পাই। নায়ক মোহনের সমস্যা একান্তভাবে শহুরে জীবনযাত্রার সমস্যা—শহরের দ্রুতগতি জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর, বৈষয়িক দিকে উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষ হবার সমস্যা।

শহরের স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি-শৈথিল্য, ভোগমসৃণ দায়িত্ববিহীন জীবনের প্রবল অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে মোহন বদলে যায়। এই পরিবর্তনের আলেখ্য রচনায় ও বিশ্লেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈপুণ্য দেখা যায়। মোহনের জীবনযাত্রা বদলেছে, মন কি পুরোপুরি বদলেছে? শহুরে মনের অন্তরালে গ্রাম্য মনের উপস্থিতি, শহরজীবনে সামঞ্জস্যবিধান, শহুরে মনের জটিলতা আর বিকৃতি, শহরজীবনের বিশালতা আর ধূসর অমানবিকতা, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যৌথ পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব-অস্বীকৃতি এবং ভোগসম্পদ আর অর্থের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ: এইসব সমস্যা এখানে রূপায়িত। শহর কলকাতার নানা স্তরের মানুষকে এখানে পাই—মধ্যবিত্ত শিক্ষিত (মোহন), নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত (শ্রীপতি, পীতাম্বর), শহুরে দম্পতি (চিন্ময় ও সন্ধ্যা), শিক্ষিত অথচ গ্রাম্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুবতী (লাবণ্য)। সামাজিক সমস্যা এবং ব্যক্তিজীবনের সংকটের মূল অন্বেষণ করতে গিয়ে লেখক অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, শহুরে জীবনে (কি গ্রাম-জীবনে) ব্যক্তির সমস্যা নিছক ব্যক্তির সমস্যা নয়; তার মূল সমাজে আর সমাজের বুনিয়াদ আর্থনীতিক শ্রেণীবিন্যাস। স্বীকার্য, "শহরবাসের ইতিকথা" উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রের জীবনে শহর কলকাতার উপস্থিতি যোজনা করেছে নতুন মাত্রা।

শহর কলকাতার জীবনে যখন সার্বিক বিপর্যয় তখনকার (১৯৪১-৪৬) কলকাতার ছবি পাই মানিকের তিন উপন্যাসে—"দর্পণ", "চিহ্ন" আর "স্বাধীনতার স্বাদ" উপন্যাসে। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশবিভাগের পূর্বমুহূর্তে অস্থিরতায় উত্তাল যে কলকাতা তার নিখুঁত ছবি পাই এ তিন উপন্যাসে। অন্ধবিদ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, হানাহানি, লালসা, শোণিতস্পৃহা একদিকে; সুস্থ মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা আর মেহনতি মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ অপরদিকে—এ দুয়ের টানাপোড়েনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে শহর কলকাতা আর সৃষ্ট ব্যক্তিচরিত্রগুলি। বলা উচিত, বহু ব্যক্তির বিশৃঙ্খল সমবায়ে গঠিত জনতা। এই জনতার অস্তিত্বে কলকাতা শহর পুরোপুরি অনুপ্রবেশ করে নি, কিন্তু তার ছাপ পড়েছে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কলকাতার ছাপ পড়েছে। "মন্বন্তর", "ঝড় ও ঝরাপাতা", "কান্না", "কীর্তিহাটের কড়চা" তার পরিচয়স্থল।

কলকাতাকে নিয়ে তারাশংকরের প্রথম উপন্যাস "মন্বন্তর"। কালসীমা ১৯৪২-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩-এর দোসরা মার্চ। দ্বিতীয় বিশ্বসমরকালীন কলকাতার নাগরিক জীবনই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। লেখকের কাছে মহাযুদ্ধই মন্বন্তর। এই পটভূমে মহানগরী কলকাতার একটি কালিমাময় আলেখ্য এখানে চিত্রিত। বাস্তবানুগ হৃদয়াবেগরঞ্জিত এক আলেখ্য, যার কেন্দ্রে রয়েছে শহর কলকাতার এক পচনশীল বিলাসী পরিবারের কাহিনী। নায়ক কানাই চক্রবর্তী এই পরিবারের সন্তান। চক্রবর্তী-পরিবারের অভিশপ্ত জীবনযাত্রা এবং কানাইয়ের অভিশাপমুক্তির কেন্দ্রীয় ঘটনা। এ উপন্যাসে সেদিনকার কলকাতার সমস্ত পচনশীলতা কলঙ্ক, বীভৎসতা, ক্ষয়িষ্ণুতার পাশাপাশি অদম্য জীবনস্পৃহা, আদর্শবাদিতা আর আশাবাদ রূপায়িত হয়েছে। চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, সেন—এই তিন পরিবারের অধঃপতনের সার্বিক ছবি আঁকা হয়েছে যুদ্ধ-কালোবাজার-ভ্রষ্টাচারের পটভূমে। আর সেই সূত্রেই সেদিনকার কলকাতা চরিত্রসমূহের অস্তিত্বের অংশীদার। আদর্শবাদী দেবপ্রসাদ সেন এখানে অবনমিত, লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত। সংসারত্যাগের পূর্বে

পরাজিত দেবপ্রসাদ বড়োছেলেকে বলে গেলেন, কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাও, 'ছেলে-দেরও চাষাবাদ করতে শিখিয়ো; লেখাপড়া যতটুকু না হলে নয় ততটুকু। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো আমার নিষেধ রইল।' কিন্তু পরাজিতের একথা কেউ শোনেনা। কারণ কলকাতা তাদের গ্রাস করে আছে।

কলকাতাকে নিয়ে তারাশংকরের দ্বিতীয় উপন্যাস "ঝড় ও ঝরাপাতা"। এতে উপলক্ষের ছাপ পড়েছে। ১৯৪৬-এর এগারোই ফেব্রুআরি থেকে শুরু করে পাঁচ-ছ দিন শহর কলকাতার বুকের উপর দিয়ে যে প্রবল ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ঝড় বয়ে গিয়েছিল, আর ঝরাপাতার মতো অকালে ঝরে পড়েছিল কয়েকটি তাজা প্রাণ, উপন্যাসে তারই আলেখ্য পাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন রশিদ আলির কারাদণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার ছাত্ররা যে মিছিল বার করেছিল, পুলিশ তার উপর লাঠি চালায় এগারোই ফেব্রুআরি। সেদিন যে রক্ত ঝরেছিল তা থেকেই দ্রুত জন্ম নেয় বিক্ষোভের ঝড়, দাবানলের মতো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিনকার প্রতিশোধ-কামী আজাদিকামী উন্মত্ত মানুষ ঝড়ের মুখে উড়ে বেড়াচ্ছিল। কেবল ছাত্র নয়, প্রবীণ নবীন নিরীহ শান্ত ভদ্র লুম্পেন—সব স্তরের মানুষ ঝড়ে যোগ দিয়েছিল। মধ্যবয়স্ক কেরানি গোপন পুলিশের গুলিতে জখম, তার চোদ্দ বছরের মেয়ে নেবু মারা যায়। লুম্পেন কানু সব ভুলে পুলিশ আর টমি খুন করতে আত্মনিযুক্ত হয়। সেদিনের কলকাতার এই উন্মাদনা সব চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে।

১৯৪২-৪৩ সালের কলকাতায় দুর্ভিক্ষতাড়িত নিরন্ন মানুষের আর্তনাদ পথে-পথে শোনা যেত। তারই পটভূমে লেখা "কান্না" উপন্যাসে তারাশংকর ফাদার স্যাথানিয়েল বিশ্বাসের চোখ দিয়ে সেদিনের কলকাতাকে দেখিয়েছেন। ভিখারিনী লনা, অনাথিনী চাচী, বস্তির ছেলে কিশোর বাচ্চি (ওরফে জন)-কে নিয়ে ফাদারের সংসার। অন্যদিকে লানী-গোমেশ-ডেভিডের সংসার। এই সংসারের ছবি-ই কলকাতা শহর। সমাজের নিচুতলার মানুষের শহর। দারিদ্র-ব্যাধি-কষ্টের শহর, লালসা বেইমানি লোভের শহর, শুদ্ধতা স্বার্থহীন ভালোবাসার শহর। এই হল কলকাতা নিয়ে তারাশংকরের তৃতীয় উপন্যাস "কান্না"। স্পষ্ট চরিত্রগুলি এই শহরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন। চার্চ হোটেল বস্তি চিড়িয়াখানা পার্ক স্ট্রীট কবরখানা নিয়ে যে শহর কলকাতা তার প্রাণস্পন্দিত আলেখ্য "কান্না" উপন্যাস।

ছয়

শহর কলকাতাকে নিয়ে তারাশংকরের উচ্চাশী উপন্যাস বিশালকায় "কীর্তিহাটের কড়চা" (চার খণ্ড)। উপন্যাসটির কালসীমা কমবেশি দেড়শ বছর। 'চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত' এর মেরুদণ্ড। উপন্যাসের মূল আখ্যানের সূচনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরম্ভের সঙ্গে, সমাপ্তি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তার অবসান ঘোষণার মধ্য দিয়ে। মেদিনীপুরের কীর্তিহাট থেকে কলকাতার মহাকরণ পর্যন্ত প্রসারিত সাতপুরুষের কাহিনীতে শহর কলকাতা অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। দেড়শ বছরের কলকাতার নতুন সমাজবিন্যাস। বিচিত্র সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নানা স্তর ও তাদের নায়কেরা এই উপন্যাসে জায়গা পেয়েছে। "কীর্তিহাটের কড়চা"কে বলা যায় ক্রনিক্ল। কিন্তু কলকাতা এখানে প্রধান চরিত্র নয়, সাতপুরুষের খোলস ধীরে-ধীরে খুলে ফেলেছে যে সুরেশ্বর সে-ই এর নায়ক, কথক, ভাষ্যকার। রায়বংশের সাতপুরুষের জীবনে নীল রক্তের আভিজাত্য প্রাধান্য পেয়েছে, শেষ পুরুষ সুরেশ্বর আভিজাতিক আচরণ-ভঙ্গের সাধনায় এক কঠিন আত্মসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সেটাই মূল কথা। তাই এখানে শহর কলকাতার চারিত্র উন্মোচন ও তার বিবর্তন প্রাধান্য পায় নি। তা আফশোসের কথা।

সেদিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতে হয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "সেই সময়" (দুই খণ্ড) সার্থক উপন্যাস। 'লেখকের কথা'য় তিনি লিখেছেন, 'আমার কাহিনীর পটভূমিকা ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ। এবং এই কাহিনীর মূল নায়কের নাম সময়। শিবনাথ শাস্ত্রী···যাকে নবযুগ বলেছেন, পরে তারই নাম হয় 'বেঙ্গল রেনেশাঁস'।···গত শতাব্দীর এই রেনেশাঁসের ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য।···সময়কে রক্ত-মাংসে জীবিত করতে হলে অন্তত একটি প্রতীক-চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। নবীনকুমার সেই সময়ের প্রতীক।'

যে সময়সীমার উল্লেখ লেখক করেছেন, তারই মধ্যে শহর কলকাতাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন। এবং এ বিষয়ে তিনি সেকালের তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন। গ্রন্থশেষে প্রদত্ত ইংরাজি-বাঙলা গ্রন্থ-তালিকা থেকে অনুধাবন করা যায়, লেখকের 'হোম-ওয়ার্কে' কোনো ফাঁকি নেই। ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের সময়সীমায় আবদ্ধ শহর কলকাতা এখানে স্পষ্ট দৃঢ় গভীর রেখায় অঙ্কিত। তাতে লেখকের কল্পনা আর কল্পিত উপাদান আছে, নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু তা কখনোই বাস্তবকে লঙ্ঘন করে নয়। তার ফলে এই উপন্যাস অনেকটা পরিমাণে নির্ভর-যোগ্য হয়ে উঠেছে। তার চেয়ে বড়ো কথা, প্রতীকী চরিত্র নবীনকুমারের মধ্য দিয়ে শহর কলকাতার নব-যৌবন কথা বলেছে। তার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতার সঙ্গে কলকাতার আত্মিক যোগ নিবিড়। নবীনকুমার নামটি লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমার বাঙলা উপন্যাসের প্রথম রোমানটিক নায়ক। সে সর্বার্থে নতুন। তাকে আর অন্য কোনো নামে অভি-হিত করা যায় না। সেইরকম সুনীলের ক্রনিক্লের নায়ক নবীনকুমার। তাকে অন্য কোনো নামে ডাকা যায় না। তারই জীবনকাহিনীর মাধ্যমে সেদিনকার শহর কলকাতা বাঙ্ময় রূপময় হয়ে উঠেছে। বস্তুত এ উপন্যাসে কলকাতা একটি জীবন্ত চরিত্র। সর্বোপরি, কলকাতা মানবচরিত্রের অস্তিত্বের অংশীদার হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসে বাস্তব চরিত্রের পাপাপাশি আছে কল্পিত চরিত্র। রামকমল সিংহ, বিশ্ববতী, নবীনকুমার, গঙ্গানারায়ণ, বিধুশেখর, বিন্দুবাসিনী, সৌদামিনী, কুসুমকুমারী, সুহাসিনীর পাশাপাশি আছে বাস্তব চরিত্র—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশব সেন, রাজনারায়ণ বসু, বেথুন, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দিবাকর, চন্দ্রনাথ, রাই-মোহন, সোহাগবালা, থাকোমণি, জামালুদ্দিন শেখ, ম্যাক গ্রেগর, যদুপতি, অম্বিকাচরণ, রতনমণি, ত্রিলোচন দাস, দুলাল, সুবালার পাশাপাশি আছে বাস্তব চরিত্র—হীরা বুলবুল, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, মহেন্দ্রলাল সরকার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। এইসব কল্পিত ও বাস্তব চরিত্রের জীবন-আখ্যানের মধ্য দিয়েই শহর কলকাতা হয়ে উঠেছে জীবন্ত চরিত্র। আর তা মানবচরিত্রের অংশীভূত হয়ে গেছে।

প্রমথনাথ বিশীর "কেরী সাহেবের মুন্সী" উপন্যাসে উনবিংশ শতাব্দের প্রথম প্রহরের কলকাতার অস্তিত্ব অনুভব করি। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রামরাম বসু এবং শহর কলকাতা। কেরি ও টমাস, শ্রীরাম-পুরের দুই প্রোটেস্টানট মিশনারিকে খ্রীষ্টান হবার আশা দিয়ে, এমনকী পদ্যে খ্রীষ্টস্তুতি লিখেও রামরাম বসু কোনোদিন স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি, সাহেবদের কাছ থেকে দু-পয়সা অর্জন করেছেন। কেরি সাহেবকে বাঙলা শিখিয়েছেন, প্রায় সারা জীবন কেরি ও শ্রীরাম-পুর মিশনের অনুগত ছিলেন, আর লিখেছিলেন দুখানি বাঙলা গদ্যগ্রন্থ—"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" (১৮০১) ও "লিপিমালা" (১৮০২) যা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিলাতি সিভিলিয়ানদের পাঠ্য ছিল। কলকাতা, শ্রীরামপুর, মালদহ তাঁর বিচরণক্ষেত্র,

প্রধান হল কলকাতা। শহর কলকাতার গড়ে-ওঠার কালের ছবিটি এখানে সুন্দররূপে চিত্রিত।

পুরনো কলকাতার আরেক ছবি পাই বিমল মিত্রের "সাহেব বিবি গোলাম" উপন্যাসে। কিন্তু সদ্য-উক্ত উপন্যাসে যেমন এখানেও তেমন ঘটেছে অর্থাৎ শহর কলকাতা হয়ে উঠেছে প্রেক্ষাপট, তা চরিত্রের অস্তিত্বের অংশীদার হয় নি। এই লেখকের "কড়ি দিয়ে কিনলাম" উপন্যাসে একই ব্যাপার ঘটেছে—দীপংকর, সতী, লক্ষ্মী চরিত্রের সাথে কলকাতার আন্তর সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি।

সাত

বিভূতিভূষণ—বন্দ্যোপাধ্যায় আর মুখোপাধ্যায়, দুজনের উপন্যাসে কলকাতা কতদূর প্রবেশ করতে পেরেছে, এ প্রশ্নের মুখোমুখি হলে অনেকেই চট-জলদি উত্তর দেবেন, বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কিছু নেই, মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বরং কিছু আছে। মনে হয়, এই উত্তর সঠিক নয়।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে পড়ে "নীলাঙ্গুরীয়" উপন্যাসের কথা। বোধ করি, এটাই প্রথম আর শেষ উদাহরণ। নীলাঙ্গুরীয়ের নায়ক শৈলেনের জীবনে কলকাতার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ধনী ব্যারিস্টারের ছোট মেয়ে তরুকে পড়াতে গিয়ে বড়ো মেয়ে মীরার সঙ্গে আলাপ ও পারস্পরিক টান—ছকে বাঁধা প্লটে নতুনত্ব কিছু নেই। যদি বা কিছু থাকে, আছে তার পরিণামে, যাকে বলা যায়, বিচ্ছেদ। এই অনুরাগ এবং মীরার সঙ্গে কলকাতার উচ্চবিত্ত বিদগ্ধ পরিশীলিত নাগরিক জীবনের একটি নিবিড় যোগ আছে। এই নায়িকাকে কলকাতা থেকে উৎপাটিত করা যায় না, বিচ্ছিন্ন করা যায় না,—এ ধরনের একটা মনোভাব নায়কের মনে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত।

সাধারণভাবে আমরা মনে করি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কলকাতার কোনো প্রভাব নেই। এটা ভুল কথা। দুটি উপন্যাসে এই প্রভাব প্রকট। "অপরাজিত" আর "অনুবর্তন" উপন্যাসে। কলকাতার কলেজে পড়ার জন্যে অপু তার মাকে ছেড়ে আসতে দ্বিধা করে না। সেখানে মায়ের চোখের জল তাকে আটকাতে পারে নি। যুবক অপুর কাছে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মননচর্চার কেন্দ্র কলকাতার বিশেষ মর্যাদা আছে। কলকাতা তার কাছে চিত্ত-প্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র, বিপুল জ্ঞানরাজ্যের প্রবেশ-দ্বার, সুবিপুল বিশ্বের বাধাহীন পথে যাত্রার সূচনা-বিন্দু।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অনুবর্তন উপন্যাসে কলকাতার প্রভাব চমৎকার রূপায়িত হয়েছে স্কুল-শিক্ষকদের জীবনে। এই শহরে সামান্য বেতনে জীবনযাত্রা নির্বাহ বড়ো কষ্টের, গ্রামের বাড়িতে গেলে মোটা চাল মোটা কাপড়ের অভাব হবে না। একথা এই শিক্ষকরা জানেন, কিন্তু মানেন না। স্কুল সেরে শেষ বিকেলে টিউশনিতে যাবার আগে ব্যস্ত মোড়ের মাথায় ডালরুটি আর চা খেতে-খেতে হ্যারিশন রোডের জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার বড়ো-বড়ো ব্যাপার নিয়ে লম্বা-লম্বা কথা বলার সুখ গ্রামে নেই। খুব সাধারণ জীবন, কিন্তু কলকাতার জীবন-স্রোতের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক অনুভব : অনুবর্তন-এ অনুস্যূত হয়ে আছে এই সত্য। মনোজ বসুর "মানুষ গড়ার কারিগরে" একই বক্তব্য রূপায়িত।

কলকাতার জীবনের সঙ্গে এই ধরনের আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করেছে সুমথনাথ ঘোষের আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস "বাঁকাস্রোত"-এর নায়ক আলোক।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ত্রিলেখ "কলকাতার কাছেই", "উপকণ্ঠে", পৌষফাগুনের পালা" মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের অন্তরঙ্গ ছবি। কলকাতা-নিকটবর্তী হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে আর কলকাতা শহরে শতাব্দ-প্রসারিত তিন পুরুষের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের

কাহিনী এই ত্রিলেখ। রাসমণি তার তিন মেয়ে শ্যামা উমা, কমলা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের পারিবারিক জীবনের দুঃখসুখে ভরা দিনগুলি ত্রিলেখে চিত্রিত। প্রথম দুটি উপন্যাসে শহর কলকাতা উপস্থিত। বস্তুত বৃহত্তর কলকাতার অন্তরভুক্ত যে অঞ্চল, তারই মধ্যে রাসমণির জীবন কেটেছে। তার গ্রামের সঙ্গে শহর কলকাতার নাড়ির বন্ধন রয়েছে। আদি কলকাতার উপভাষায় তারা কথা বলে, কলকাতায় প্রতিদিন জীবিকা-সংগ্রহে যায়। স্বীকার্য, কলকাতার নীচু তলার মানুষ—হতদরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে রাসমণির পরিবার। কলকাতার আলিঙ্গনে তারা নিষ্পিষ্ট, অথচ সে আলিঙ্গন থেকে মুক্তিলাভের কথা ভাবতে পারে না। এখানেই কলকাতা তাদের অস্তিত্বে অনুপ্রবিষ্ট।

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রিলেখ "প্রথম প্রতিশ্রুতি"-"সুবর্ণলতা"-"বকুলকথা"। এর মধ্যে দ্বিতীয় উপন্যাসে কলকাতার প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। কলকাতার মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার, ছোটো-মন ছোটো-ঘর ছোটো-জানালায় আবদ্ধ মানুষ কীভাবে নিত্য কলহ করে, জীবিকা অন্বেষণ করে, বাঁচে আর মরে। তারই আলেখ্য এ উপন্যাস। এরই মধ্যে কীভাবে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ায়, দাঁড়াবার জন্য কিভাবে লড়াই দেয়, তার কাহিনী এই আলেখ্যে পাই। এবং অনুধাবন করি, আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে কলকাতা তাকে সাহস, প্রেরণা, ভরসা জুগিয়েছে। এখানেই কলকাতা তার জীবনে অনুপ্রবিষ্ট। এই সত্য নায়িকা মনে-মনে জানে অথচ তাকে প্রকাশ করতে পারে না। তবু তার অন্তহীন সংগ্রামে কলকাতার পরিবেশ-চারিত্র্য নিত্য প্রেরণা জোগায়।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) "জঙ্গম" উপন্যাসে শহর কলকাতার উপস্থিতি প্রকটতর, যা সদ্য আলোচিত ছয় লেখকের উপন্যাসে পাই না। তিরিশের দশকের কলকাতা এখানে প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। কলকাতার জীবনে যে তীব্র-গতি প্রবাহ, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা আছে, উপন্যাসের নামে তার ইঙ্গিত পাই। অস্থির অশান্ত দ্রুতধাবমান জীবনপ্রবাহেরই নাম কলকাতা। তিরিশের দশকের কলকাতা-শহরের চঞ্চল অস্থির রূপটি জঙ্গমে রূপায়িত। চরিত্র ও ঘটনার পরিণতিহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা—এ উপন্যাসের ত্রুটি নয়, বৈশিষ্ট্য। অস্থির অশান্ত বিঘূর্ণিত জলরাশির যে জীবন ধেয়ে চলেছে, তার ফেনশীর্ষে কত চরিত্র ভেসে উঠেছে, আবার দিকহারা পথে অন্তর্হিত হয়েছে। নিছক ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে, উদ্‌ভাবনী শক্তির পরিচয়ে, বিস্ময়কর সৃষ্টিপ্রাচুর্যে, জটিল ও দূরবিস্তারী ঘটনাপুঞ্জের মাধ্যমে জীবনের বিসর্পিত বিস্তারে, জীবনের প্রতিবেশ ও বহিরঙ্গ-বিন্যাসে "জঙ্গম" চমকপ্রদ উপন্যাস। কলকাতার দুর্মদ প্রাণশক্তি এর ঢালিকা। সে চালায় ঘটনাস্রোতকে, চরিত্রসমূহকে। "জঙ্গম" এক বিচিত্র চরিত্রশালা—শংকর, উৎপল, ভনটু, ভনটুর বৌদি, ভনটুর বাবা বাকু, নটবর ডাক্তার, করালীচরণ বক্সি, মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী, অপূর্ব পালিত, ওরিজিন্যাল দশরথবাবু, লোকনাথবাবু, মৃন্ময়, মুখুজ্যেমশায়, নিপুদা, অধ্যাপক মিত্র ও গুপ্ত, মিষ্টিদিদি, বারবনিতা মুক্তা, রিনি, অমিয়া, সুরমা, কুন্তলা দেবী, হাসি, বেলা মল্লিক, যূথশরিয়া, চুনচুন, শৈল—চরিত্রের শেষ নেই, বৈচিত্র্যের অন্ত নেই, তাদের চলারও শেষ নেই। (অবশ্যস্বীকার্য, 'জঙ্গম'-এ কলকাতার এই প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিহারের শান্ত গ্রামাঞ্চল)।

আট

তিরিশের যুগের শহর কলকাতার জীবনচাঞ্চল্যপূর্ণ অস্থির রূপটি বনফুলের "জঙ্গম"-এ রূপায়িত। বস্তুত কলকাতার এমন অন্তরঙ্গ ছবি সন্তোষকুমার ঘোষের "কিনু গোয়ালার গলি" আর "মোমের পুতুল" ছাড়া অন্যত্র প্রাধান্য পায় নি। কলকাতা যেন এক

পরাক্রান্ত সহস্রচক্ষু পরুষ দৈত্য যার আশ্লেষে ধরা দেয় শংকর ও তার পরিচিত চরিত্রেরা (জঙ্গম), নীলা (কিনু গোয়ালার গলি), সুধা (মোমের পুতুল)। বস্তুত সন্তোষকুমারের উপন্যাস কলকাতা-ব্যতীত নয়। আশ্চর্য নয় যে "মোমের পুতুল" পরবর্তী কালে "সুধার শহর" নামে প্রকাশিত।

সন্তোষকুমারের প্রিয় থীম—কলকাতার জীবন—পূর্ণতা পেয়েছে "মোমের পুতুল"-এ। গ্রামের মেয়ে সুধা মুখ্যচরিত্র। সুধা কি কলকাতাকে গ্রহণ করেছে, অথবা, কলকাতা কি গ্রামের কিশোরীকে আত্মসাৎ করেছে—এ প্রশ্নের উত্তর এই উপন্যাসে সন্ধান করতে হয়। সুধার দৃষ্টিতে কলকাতা বৃহত্তর মহত্তর জীবনের প্রতীক।

কলকাতার ফুলমাসি (অতসী) চেয়েছিল বোনের একটি মেয়েকে, তাই মা দিয়ে দিল সুধাকে। অন্য তিন বোনের কাউকে নয়, সুধাকেই। সুধা প্রথম যেদিন কলকাতা যায়, সেদিন তার ভালো লেগেছিল—

> শেয়ালদা স্টেশনে আলো, রাস্তায় সারি-সারি গাড়ি, কাতারে-কাতারে লোক, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ। কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। সেই ভালো লাগাটুকু যেন দেশলাইয়ের মতো ফক করে জ্বলে উঠেই নিবে গেছে। এই মাটিহারানো, আকাশখোয়ানো শহরটাকে সুধার মোটে পছন্দ নয়।

উপন্যাসের সূচনায় এই ছবি। সুধা ফাঁক পেলেই ছাদে চলে যেত। সুদূরের ইশারায় ভরা দুপুরের উদাসসৌন্দর্য, বন্দী নারকেলগাছের অসহায়তা সুধার ছবিকেই স্পষ্ট করে তোলে।

কয়েকমাস বাদে সুধা গ্রামে ফিরে এল। কিন্তু যে সুধা গিয়েছিল, সে সুধা ফেরে নি। ফিরে এসে আত্মীয়দের সুধার মনে হয় অপরিচিত, তাদেরও সুধাকে মনে হয় অপরিচিতা। কলকাতা থেকে মেয়ে ফিরেছে। মা (মল্লিকা) তাকে দেখছে, মনে হচ্ছে—

> সে-ই বটে, তবু সে নয়, এক হয়েও যেন একটু আলাদা। সুধাও মাকে, তার পরিবারকে, পুরনো পরিবেশকে দেখছে, অনুভব করছে তার জীবনে এসেছে পরিবর্তন। সর্বজয়া (মা) আর অপু (ছেলে) পরস্পরকে এমন করে বিশ্লেষণ করে নি, কিন্তু এখানে মল্লিকা (মা) আর সুধা (মেয়ে) তা করেছে। সুধা চমকে ওঠে। সে জীবনকে জেনেছে। হয়তো এই জানাটুকুই পাপ। জীবনের বিচিত্ররূপ দেখেছে, তার তিক্ত কটু কষায় স্বাদ পেয়েছে। জানাই পাপ, পাপই মৃত্যু। তবু সে পথেই সুধা এগোয়। জীবনকে, নিজেকে, তার উদ্‌ভিন্ন যৌবনকে জানা সুধার কাছে সমার্থক হয়ে যায়। কলকাতা হয়ে ওঠে তার সব জানার প্রতীক। মা (মল্লিকা) ভাবে তার মেয়ে (সুধা) এমন করে বদলে গেল কেন? কাকে সে ভালোবাসে? নিশীথের চিঠি হাতে পেয়ে মল্লিকার ধারণা, তাকেই বুঝি সুধা ভালোবাসে।
>
> কী করে তাকে সুধা বোঝাবে নিশীথ নয়, নিশীথ নয়, মনে মনে সে যাকে বরমাল্য দিয়ে বসে আছে, তার নিঃশ্বাসে কালি, যন্ত্রে হৃৎস্পন্দ, পাথরে বুক বাঁধানো; তার স্পর্শে বুক দুরু দুরু করে, বিতৃষ্ণায় সর্বাঙ্গ শুকিয়ে যায়, তবু সেই দৈত্য প্রবল দুটি বাহু বাড়িয়ে ভীরু একটি পল্লী-কিশোরীকে অহরহ টানে। যার কাছে গেলে জ্বালা, দূরে গেলে বেদনা, সুধা আত্মনিবেদন করেছে, পুরুষ, পরাক্রান্ত মহানগরের সমগ্র সত্তার কাছে। (অধ্যায় ১৫)

এখানেই সুধার জন্মান্তর। প্রচণ্ডপ্রাণ কলকাতার আশ্লেষে ধরা দেওয়াই সুধার পরিণতি। সুধার বাবা (নীরদ) সুধাকে তার মামার (শশাঙ্ক) হাতে দিয়েই দেয়, বলে—'ওকে এখানে রাখতে পারব না; আমি জানতাম।'

তারপর আবার সেই সুড়ঙ্গ স্টেশন, শেয়ালদা; খাঁচা-শহর কলকাতা। শশাঙ্কের হাত ধরে সুধা নামল প্ল্যাটফর্মে, রিকশায় উঠল। তখন ঘোর

> সন্ধ্যা, বিজলী-দ্যুতিতে ইন্দ্র-শহরটার সহস্র চক্ষু প্রকট, ঘর্ঘর-রব কর্কশ পথ, প্রবল একটি নিরবধি প্রবাহ। ঠুনঠুন টিমেতেতালা গতি, সুধা রিকশায় গা এলিয়ে দিয়েছে, ক্লান্ত, আচ্ছন্ন, তবু সম্মোহিত। (অধ্যায় ১৮)

এই প্রবলপরাক্রান্ত কলকাতাকে—১৯৪১ থেকে ১৯৪৫-এর কলকাতাকে পাই বিমল করের "দেওয়াল" উপন্যাসে। তিন পর্বে বিভাজিত বৃহৎ উপন্যাসে কালসীমা লেখক চিহ্নিত করে দিয়েছেন: প্রথম পর্ব: "ছোট ঘর", ঘটনাকাল ১৯৪১-এর মাঝামাঝি থেকে জুলাই ১৯৪২; দ্বিতীয় পর্ব: "ছোট মন", ঘটনাকাল জুলাই ১৯৪২ থেকে ডিসেমবর ১৯৪৩; তৃতীয় পর্ব: "খোলা জানলা", ঘটনাকাল জানুআরি ১৯৪৪ থেকে জুন ১৯৪৫। যে অঞ্চল এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল—তা বউবাজার অঞ্চল। শিয়ালদা, ওয়েলিংটন স্কয়ার, কলেজ স্কয়ার, বউবাজার স্ট্রিটের চতুঃসীমানায় ধৃত। এই উপন্যাসে চিহ্নিত কালসীমায় শহর কলকাতার বিপর্যস্ত, আন্দোলিত, উন্মূলিত, উজ্জীবিত ছবি ধরা পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বসমরের অভিঘাত, জাপানি বোমারু বিমান থেকে বোমা বর্ষণ, অগস্ট আন্দোলন, বন্যা, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, ব্ল্যাকআউট, কনট্রোল, চোরাবাজার, ব্রিটিশরাজের সঙ্গে কংগ্রেসের দরাদরি, রাজনৈতিক দলগুলির বিভ্রান্তি, স্বচ্ছ লোভনীয় চাকরির হাতছানি, ইভাকুয়েশ্যন, এ. আর. পি. আর সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি, বেকারির অভিশাপ। দলে-দলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গরিবদের ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, মূল্যবোধের ও বিবেকবুদ্ধির পরাজয়, ভদ্রতা সততা সুরুচির বিদায়—এইসব নিয়েই কলকাতা। সেদিনের (১৯৪১-১৯৪৫) পটভূমি কলকাতার নিষ্করুণ ছবি, নিম্নমধ্যবিত্তের সার্বিক অধঃপতনের আলেখ্য। অবক্ষয় ভাঙন সংকটের ছবি। বিশৃঙ্খলা বিপর্যয়ের ছবি। ন্যায় নীতিবোধের, মানবিক ও পারিবারিক সম্পর্কের এবং মূল্যবোধের সমূহ অবসানের ছবি। এই সময়ের শহর কলকাতার বিশ্বস্ত প্রতিরূপ, দলিল "দেওয়াল" উপন্যাস। এরই মধ্য দিয়ে পথ চিনে চলেছে সুধা, পেতে চেয়েছে ভালোবাসার আশ্রয়। উপন্যাসের শেষে ভগ্নপ্রায় সুধা আর সুচারু পরস্পরের উপর নির্ভর করতে চেয়েছে। সেটাই তাদের শেষ অবলম্বন।

লেখক শহর কলকাতার হিন্দু মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের ছবি এঁকেছেন। সেদিনকার (১৯৪১-৪৫) কলকাতার নিম্নবিত্ত সমাজের আসল চেহারাটা সে ছবিতে স্পষ্ট। সব শুভবুদ্ধি, সব পরার্থপরতা, সব মূল্যবোধের অবসান।

> বড় চাপা গভীর দুঃখের একটু হাসিহাসল সুধা। যেন বলল, হ্যাঁ—আমরা এমনই। আমাদের মন এমনই ছোট। পনেরো বছরকে ভুলে যাই। যদি সুযোগ পাই ভুলে যাবার। আমরা সবাই মনে এখন ঠিক এইরকম ছোট হয়ে গেছি। বাঁচার, পেট ভরাবার, গায়ের কাপড়ের রেষারেষিতে—এখন এই রাক্ষুসে দিন আমাদের এই রকম ছোটো করে তুলেছে। আমরা মেয়ে বেচছি, বোন তাড়াচ্ছি, বউ ছাড়ছি—ওই রাস্তার কাঙালদের মতন। কী করব, কী করতে পারি বল। (পরিচ্ছেদ ১৯, দেওয়াল, দ্বিতীয় পর্ব—ছোটমন)

সমগ্র উপন্যাসে এই রাক্ষুসে দিনের প্রবল অভিভবের কাছে অসহায় নিম্নমধ্যবিত্তের শোচনীয় পরাজয়ের, বেদনার, আত্মগ্লানির ছবি। এই ভয়ংকর দিনে কোনো শুভবুদ্ধি, কোনো মূল্যবোধ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। উপন্যাসের শেষে দেখি নায়িকা সুধার মুখে তার স্বীকৃতি। সুধা আজ বিধ্বস্ত, ধ্বংসস্তূপ মাত্র। তার ভালোবাসার পাত্র সুচারুর কাছে তার বক্তব্যে ভয়ংকর রাক্ষুসে দিনের কাছে সার্বিক পরাজয়ের কথাটি প্রাধান্য পেয়েছে।

> 'আমাদের এই সময়টাই বোধহয় এইরকম। সবাই ভাঙা, সকলেরই সমান অবস্থা, টুকরো-টাকরা হয়ে আমরা আছি, নিটোল পুতুল কেউ নই। হয়ত তাই দুই অন্ধ খোঁড়া মিলে থাকতে হবে

আমাদের।'

'না থাকলে?'

'আরও দুঃখ। তোমায় যদি আমি আজ আমার কষ্ট অভাব অসামর্থ্য দিয়ে না বুঝি, তুমি আমায় না বোঝ, আর কে বুঝবে।'

সুচারু স্তব্ধ। শ্বাস বন্ধ করে যেন কথাগুলি শুনছিল সুধার। সুধা কি ঠিক বলেছে?

আজকের ক্ষয়িত, অক্ষম, আংশিক, এই অপূর্ণমানুষের দিকে সুচারু যেন তাকিয়ে থাকল। সুধাকে সেখানে দেখা যায়। সুচারুকেও। ভাঙা মূর্তির মতন পাশাপাশি বসে আছে। (দেওয়াল, খোলা জানালা, পরিচ্ছেদ ২৮, উনিশের পৃষ্ঠা)

ক্ষয়িত, অক্ষম, অপূর্ণ, বিধ্বস্ত মধ্যবিত্তের এই ছবি সেদিনের কলকাতার ছবি। বিমল করের দেওয়াল উপন্যাসে এভাবেই কলকাতা মানুষের অস্তিত্বে ঢুকে গেছে।

সে-ছবি সামান্য স্থানান্তরে দেখা গেছে সমরেশ বসুর "শ্রীমতী কাফে" উপন্যাসে। কলকাতার অদূরে —বারাকপুরের রেল স্টেশনের কাছেই—চার্নক ফাঁড়ির নিকটে ভজন ওরফে ভজুলাটের শ্রীমতী কাফে। তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ঘটনাপ্রবাহ। বৃহত্তর কলকাতার অন্তরভুক্ত এই এলাকার সামাজিক চেহারা আর "দেওয়াল" উপন্যাসের সামাজিক চেহারা খুব-একটা ভিন্ন নয়। তবে তার উপরে একটা মফসলের দীনতার ছাপ পড়েছে। ঘটনাপ্রবাহ খুব দ্রুত ছুটে চলেছে। ১৯২২ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সময়সীমার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে একদল মানুষ। সবাই মধ্যবিত্ত। আসলে নিম্ন মধ্যবিত্ত। ইংরেজ আমল—গভর্নরের শাসন—লীগ মন্ত্রিসভার শাসন আমলে পুলিশ-মিলিটারির শাসন। তারই মধ্যে বিপ্লবী দলের নানা গোপন কর্মকাণ্ড, তার পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, আন্দামান থেকে রাজবন্দীদের ফেরত পাবার দাবিতে আন্দোলন, 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' দাবিতে অগস্ট আন্দোলন, শেষে প্রাপ্তি খণ্ডিত স্বাধীনতা। ফজলুল হক, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ, বাটলিওয়ালা, ডাঙ্গে, মুজফফর আহমদ—লেখকের কথায় 'এ দেশীয় রাজনীতির আদি ও শেষ' (পৃ ২৮৩) এরই পটভূমিতে গান্ধীবাদী কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, যুগান্তর দলের নানা প্রকাশ্য ও গুপ্ত আন্দোলন। এরই পটভূমিতে আন্দোলিত, উত্তেজিত, বিদীর্ণ, বিধ্বস্ত শুটিকয়েক মধ্যবিত্ত মানুষ। শহর কলকাতার সঙ্গে নানা স্বার্থসূত্রে আর প্রেরণাসূত্রে বাঁধা বারাকপুর।

উপন্যাস শুরু হয়েছিল বর্দৌলি কংগ্রেসের উল্লেখের মধ্য দিয়ে (১৯২২); শেষ হয়েছে কাহিনী-সমাপ্তির আট বছর পরে (১৯৪৮)। মামলাবাজ, মদখোর প্রাক্তন নায়েব মহাদেব হালদারকে নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। তার রেস্ত তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মামলায় বারবার হারছে, তবু তার মনে হয় পরের বার জিতবে। এটাই মামলাবাজ মধ্যবিত্তের ললাট-লিপি। তার ছেলে ভজুলাট, তার চায়ের দোকান "শ্রীমতী কাফে"। সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ মধ্যবিত্তের যে সম্প্রসারণ ঘটে রাজনীতি-বৃত্তে, ভজন ও তার দাদা নারায়ণের মধ্য দিয়ে লেখক সেটা দেখিয়েছেন। বিপ্লবী নারায়ণ গোপনে আসে যায়, চোরাই রিভলবার কেনে, পুলিশের ফাঁদ এড়িয়ে পালায়। তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে ভজনলাল ও তার বন্ধুরা, যারা নীচুতলার মানুষ। একদিকে পুলিশি সন্ত্রাস, অপরদিকে নিম্নমধ্যবিত্তের লাঞ্ছিত জীবন। এই উপন্যাসে সমাজের যে ছবি পাই (পৃ ২৩) তা হল, উত্তর চব্বিশ পরগনার এই ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে পাড়ায় ঘরে সীমাহীন নীচতা ও হীনতা। অর্থ ও যৌবনের লালসার নোংরা দাগ অনেক ঘরে গুপ্ত ছাপ রেখে গিয়েছে।

সমাজের এই ছবি তারাশংকরের "মন্বন্তর", "ঝড় ও ঝরাপাতা", "কান্না" এবং বিমল করের "দেওয়াল" উপন্যাসে চিত্রিত ছবি থেকে ভিন্ন নয়, যেমন ভিন্ন নয়

কলকাতায় চারের ও পাঁচের দশকের রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় উদ্বেল মফসল। 'দেওয়াল'-এর বাহুর সঙ্গে 'শ্রীমতী কাফে'র ভজনের খুব একটা ব্যবধান নেই। সেই একই ভেঙে-পড়া নিম্ন মধ্যবিত্তের খেয়োখেয়ি ইতরতা নীচতার পরিবেশে দুজনে দাঁড়িয়ে আছে। 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসে অবক্ষয়ের যে ছবি তিনের ও চারের দশকের, 'দেওয়াল' উপন্যাসে সে ছবি পাঁচের দশকের। এইসব দশক আর বৃহত্তর কলকাতার উপরে আধিপত্য করছে যে, তার নাম সময়, বড়ো ভয়ংকর নিষ্ঠুর সময়। এরই প্রতিনিধি সহস্রচক্ষু পরাক্রান্ত দৈত্য শহর কলকাতা। এই সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সে অনুপ্রবিষ্ট। তার কাছে ব্যক্তি অসহায়।

---

* এই নিবন্ধের উপজীব্য প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যায়ের বাঙলা উপন্যাস।

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্ত মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

বিতর্ক

১

"অসৎ আক্রোশ"

হুমায়ুন আজাদ

"মতামত" বিভাগের চিঠিপত্রে নিতান্তই ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কটূক্তিপূর্ণ অংশগুলি সাধারণত বাদ দেয়া হয় ; বাকি অংশ পুরোপুরি অবিকৃত আকারেই ছাপা হয়। সর্বক্ষেত্রেই আমরা এই নিয়ম যথাসাধ্য মেনে চলি—সম্পাদক

মৃণাল নাথ কখনো আমাকে বলেছেন 'একমাত্র' ভাষাবিজ্ঞানী, কখনো পরিহাস করেছেন 'প্রথম' কথাটি নিয়ে। 'একমাত্র' বলার রহস্যটি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ;—আমার সম্পর্কে এটাই কি এখন জনপ্রিয় রটনা ? বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্বের পেশাদার শিক্ষকেরা আমাকে নিয়ে সমস্যায় আছেন, বেশ বিব্রত পেশাজীবন যাপন করছেন তাঁরা, তার কি বিস্তার ঘটেছে পশ্চিম বাঙলায়ও ? মৃণালবাবু সম্ভবত ইংরেজিতে একটু কাঁচা ; নইলে তিনি বুঝতেন "প্রোনোমিনালাইজেশন ইন বেঙ্গলি"র পরিচিতিতে বইটিকে 'একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ' বলা হয় নি, বলা হয়েছে 'পারহ্যাপস দি মোস্ট ইমপোরট্যাণ্ট ওয়র্ক'। "তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান"-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'মনে হয় এটিই বাঙলায় তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যগ্রন্থ লেখার প্রথম উদ্যোগ।' 'মনে হয়' কথাটির তাৎপর্য ও 'উদ্যোগ'-এর অর্থ মৃণালবাবু নিশ্চয়ই বোঝেন। এমন উদ্যোগ অনেক আগেই নেয়া উচিত ছিলো অন্যদের, বিশেষ ক'রে এ-বিদ্যাটির চর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের, কিন্তু নেয়া হয় নি, কারণ আমাদের পেশাদার ভাষাতত্ত্ব-শিক্ষকেরা বন্ধ্যা,—'পেশাগত কারণে ও ছাত্রদের প্রয়োজনে' তাঁরা বিষয়ের সঙ্গে 'কিঞ্চিৎ সম্পর্ক' রাখেন তবে বইপত্র লেখেন না। অথচ বাঙলা ভাষায় দরকার ভাষাবিজ্ঞানের প্রচুর বইপত্র। পেশাদার শিক্ষকেরা ভাষাতত্ত্বকে পরিণত করেছেন এক তান্ত্রিক শাস্ত্রে, যেখানে অন্যরা সহজে ঢুকতে পারে না, এবং ঢোকার উৎসাহও পায় না। ভাষাবিজ্ঞান আমার একটি অংশমাত্র, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি কিছু বইপত্র লিখতে, যাতে এটি একটি আধুনিক বিদ্যা ব'লে গৃহীত হয়। তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব বা বিজ্ঞান আমার এলাকাও নয়, তবু আমি চেষ্টা করেছি বিদ্যার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে। ভাষাতত্ত্ব-শিক্ষকেরা যদি তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বই লিখতেন, তাহলে আমার এ-উদ্যোগ নেয়ার দরকার হতো না। সুকুমার সেনে যে আর চলে না, এটা নিশ্চয়ই তাঁরা বোঝেন। মৃণালবাবুকে অনুরোধ জানাই, তিনি এ-বিষয়ে একটি বই লিখুন, যদি সারা জীবনেও তিনি এ-বিষয়ে একটি বই লিখতে পারেন, এবং সেটি যদি এ-বইটির থেকে ভালো হয়, তাহলে আমিই তাঁকে প্রথম অভিনন্দন জানাবো।

মৃণালবাবুর প্রধান ক্ষোভ হচ্ছে যে বইটি আমি বিভিন্ন বিদেশী বই আশ্রয় ক'রে লিখেছি, কিন্তু তা স্বীকার করি নি। তিনি যদি একটু সৎ ও কিছুটা কম আক্রোশগ্রস্ত হতেন, তাহলে তাঁর উত্তেজনার কোনোই কারণ থাকতো না। এটি কোনো গবেষণাগ্রন্থ নয়, ভাষাবিজ্ঞানের জগৎকে নাড়া দেয়ার কোনো উদ্দেশ্য এর নেই ; এটি স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে লেখা একটি পাঠ্যগ্রন্থ মাত্র। ভূমিকায় আমি স্পষ্ট বলেছি, 'বইটি রচনায় আমি দ্বিধাহীনভাবে সাহায্য নিয়েছি বিভিন্ন বইয়ের—বিশেষ ক'রে ইংরেজিতে লেখা বইয়ের ; এবং দরকারমতো সে-সব বই থেকে দু-হাতে নিতেও

দ্বিধা করি নি।' এর পর আর কী থাকে মৃণালবাবু ? আমার সবকিছুই তো আপনার নখের আয়নায়, শুধু এটুকুই চোখে পড়লো না ? আপনি কি খণ্ডকালীন অন্ধত্বে ভোগেন ? যদি কেউ আশা করেন একটি পাঠ্যবই লেখার জন্যে আমি উনিশ-বিশ শতকের সমস্ত মূলগ্রন্থ পড়বো, তাহলে তিনি উন্মাদ ; আর যদি কেউ বইটি লেখার জন্যে আমি সমস্ত মূলগ্রন্থ পড়ি নি ব'লে চৌরাস্তায় দাঁড়ান, তবে তিনি অস্বভাবী মানসিকতাসম্পন্ন। ওই ধরনের দুরাশা থেকে কখনো পাঠ্যবই লেখা হ'তে পারে না। উৎস স্বীকার করি নি ব'লে তিনি যে-অভিযোগ করেছেন, তাও ঠিক নয়। যেখানে দরকার, সেখানে স্বীকার করা হয়েছে ; তবে তা ঋণস্বীকারের জন্যে নয়, ছাত্রদের আরো পাঠে উৎসাহিত করার জন্যে। তিনি বলেছেন, ধরা পড়ার ভয়ে আমি স্বদেশী লেখকদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছি নিষ্ঠার সাথে। ধরা পড়ার ভয়ে নয়, আমি স্বদেশী ঋণ স্বীকার করেছি ধার্মিকতাবশতও নয় ; বরং এজন্যে যে স্বদেশীদের কোনো কোনো তথ্য ও তত্ত্বে আমার সন্দেহ আছে। বিদেশীদের বেলায় ওই সন্দেহ আমার বিশেষ নেই। পশ্চিম থেকে নেয়ায় অতোটা উত্তেজনার কোনো কারণ নেই। আধুনিক বাঙালির সমগ্র সাহিত্য ও জ্ঞান তো পশ্চিম থেকে ঋণ-করা সম্পদেই গড়ে উঠেছে। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ ও অন্যরা কতো নিয়েছেন পশ্চিম থেকে ; অনেক সময় নিয়েছেন অনুবাদের মতো ক'রে ; এবং এ-প্রক্রিয়ায়ই গ'ড়ে উঠেছে আধুনিক বাঙালির সাহিত্য ও জ্ঞানের এলাকাটি। বাঙলার প্রধানেরা পশ্চিম থেকে দু-হাতে নিতে কখনো দ্বিধা করেন নি, শুধু গৌণরাই আবর্তিত হয়েছেন মৌলিক মূর্খতার মধ্যে। ভাষাবিজ্ঞানকেও যদি আমরা একটি আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক বিদ্যায় পরিণত করতে চাই, তাহলে দু-হাতেই নিতে হবে। নইলে কিছু পেশাদার শিক্ষক পাবো, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী পাবো না।

ভাষাবিজ্ঞানের পেশাদার শিক্ষকেরা বই লেখেন না, ঠিকমতো অনুবাদও করতে পারেন না ; এমনকী বাঙলা ভাষাটিও ঠিকমতো লিখতে পারেন না। ভাষাবিজ্ঞানের বইপত্র সাধারণত অপাঠ্য অশুদ্ধ বাঙলা ভাষায়ই লেখা হয়। আমি ভাষাবিজ্ঞানের ভাষাকে অশুদ্ধতা-অপাঠ্যতার হাত থেকেও উদ্ধারের চেষ্টা করেছি ; এবং তা অনেকে লক্ষ্যও করেছেন। বাঙলাদেশের প্রকাশিত যে-দুটি বইয়ের উল্লেখ তিনি করেছেন, যদি তিনি সৎ হতেন, তাহলে উল্লেখ থেকে বিরত থাকতেন ; দেখতেন ওই বই দুটি কতো রকমের ভুলে ও ভুল অনুবাদে ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। আমার বইটিতে অন্তত তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক ভুল নেই ; অশুদ্ধ বাক্য নেই। মৃণালবাবু নিজেও শুদ্ধ—যুক্তিসঙ্গত—বাঙলা বাক্য লিখতে মাঝে-মাঝেই ব্যর্থ হন। তাঁর প্রথম বাক্যটিই যুক্তিগতভাবে অশুদ্ধ। তিনি লিখেছেন, '১৯৫৭ সাল ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যতোটা না যুগান্তর বয়ে আনে চমস্কীয় বিপ্লবের ফলে তার চেয়েও বেশি বৈপ্লবিক বলা যেতে পারে ১৭৮৬ সালের স্যর উইলিয়ম জোনসের দৃপ্ত উচ্চারণকে।' বাক্যটিতে রয়েছে যৌক্তিক অস্বচ্ছতা ; কার সাথে কার তুলনা করছেন, তিনি তা বুঝে ওঠেন নি। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটিও ত্রুটিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, 'আলোচ্য বইটি সম্পর্কে তাঁর দাবি হয়তো কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য, সর্বাংশে তো নয়ই।' বাক্যটির প্রথমাংশে যে-সামান্য হ্যাঁ-সূচকতা আছে, তার ফলে দ্বিতীয়াংশে না-সূচকতা থাকতে পারে না। বলতে পারতেন, 'তাঁর দাবি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সত্য নয়, সর্বাংশে তো নয়ই।' অস্বীকার করলে এখানে দু-অংশেই অস্বীকার করতে হবে। আমাদের পেশাদার ভাষাতত্ত্ব-শিক্ষকেরা এমন অশুদ্ধ গদ্যেই মাঝে-মাঝে লেখেন, এবং বিদ্যাটিকে হাস্যকর ক'রে তোলেন।

বাংলাদেশ

২

মিখাইল গোরবাচেভ কি আদৌ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা?

মিহির মিশ্র

"চতুরঙ্গ"র জুন ১৯৮৯ সংখ্যায় আমার উক্ত শিরোনামের আলোচনার কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপত্তি তুলে শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপরীত কিছু মন্তব্য করেছেন, এবং শেষে স্তালিনোত্তর সোভিয়েত নেতৃত্ব ও গোরবাচেভের নীতির বিরুদ্ধে আমার যুক্তিতর্কের কোনোরকম খণ্ডন না করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন 'উপরের আলোচনার উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে, মিহিরবাবু যেভাবে গোরবাচেভের মূল্যায়ন করেছেন তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া অনুধাবনক।' (চতুরঙ্গ, অগস্ট ১৯৮৯, পৃ ৩৪৩)

তপনবাবুর আলোচনাটি পড়ে মনে হয়, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। উনি স্তালিনকে সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি স্তালিনের মধ্যে কোনো গুণ দেখতে পান না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে তাঁর কোনো অবদানই তিনি দেখতে রাজি নন। এমন মানসিকতার বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক-তথ্য পরিবেশন করেও কিছু করা সম্ভব বলে মনে হয় না। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কিন্তু একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, স্তালিন তাঁর সময়ে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং দমননীতির আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও যদি জনসমর্থন না পেতেন তবে কখনোই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারতেন না। তাঁর জনসমর্থন লাভের কারণ হিসাবে আমরা লেনিন-অনুসৃত কৃষিতে কলেকটিভাইজেশন এবং শিল্পায়নের নীতি অনুসরণে তাঁর সফলতা এবং তাঁর প্রতি একটা মোহজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতাকেই নির্দেশ করতে পারি। অবশ্য একথা অস্বীকার করা মুশকিল যে, সোভিয়েত জনগণের এবং পার্টি-সদস্যদের পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক চেতনার উপর ভিত্তি করেই তিনি এই মোহজাল সৃষ্টি করেছিলেন।' (পৃ. ৩৪৩)

চিন্তার জগতে এবং সমাজপ্রগতির তত্ত্বে নতুন অবদানের জন্য তপনবাবুকে ধন্যবাদ। একজন রাষ্ট্রনায়ক 'অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও দমননীতির আশ্রয়' নিয়ে নিজের প্রতি 'মোহজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতা'র সাহায্যে লেনিনের মতো একজন মহান বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিকমনোভাবাপন্ন তাত্ত্বিকের 'কলেকটিভাইজেশন এবং শিল্পায়নের নীতি' সফলভাবে 'অনুসরণ' করতে পেরেছিলেন, কারণ 'সোভিয়েত জনগণের এবং পার্টি-সদস্যদের পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক চেতনার উপর ভিত্তি করেই তিনি এই মোহজাল সৃষ্টি করেছিলেন।' সত্যি, অতুলনীয়! সোনার পাথরবাটি আর কাকে বলে! তপনবাবু, এর বিরুদ্ধে যুক্তি হাজির করার কি আদৌ দরকার করে! পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনা সত্যিই শিশুসুলভ আতুরেপনা।

এ প্রসঙ্গে মিখাইল গোরবাচেভের একটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করব এবং তার থেকে একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দেব। [বলে রাখা ভালো, পরবর্তী কালে গোরবাচেভ বা তাঁর নেতৃত্বাধীন প্রশাসন এর বিপরীত আচরণই করেছেন। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেই বেশি আকর্ষণীয় হত।] মহান অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৭০তম বর্ষে ১৯৮৭ সালের ২ নভেমবর গোরবাচেভ একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেখানে তিনি লেনিনের

মৃত্যু এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালকে সোভিয়েত ইতিহাসের সবথেকে কঠিন সময় বলে চিহ্নিত করেন। সেই সময় অন্যান্য কঠিন সমস্যার সঙ্গে 'কয়েকজন শ্রদ্ধেয় নেতার পেটি-বুর্জোয়া চরিত্র তাঁদের ঘাড়ে চেপে বসে। তাঁরা উপদলীয় মনোভাব নেন। এর ফলে পার্টি সংগঠনগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ে, খুব গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় থেকে তাদের মনঃসংযোগ নষ্ট হয় এবং তাদের কাজে বিঘ্ন হয়। পার্টির ব্যাপক সংখ্যাগুরু অংশ দেখতে পায় যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি লেনিনের ধারণা ও পরিকল্পনার বিপরীত এবং তাঁদের প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ ও দেশকে সঠিক ধারা থেকে বাইরে ঠেলে দিতে পারে। তা সত্ত্বেও আলোচ্য নেতারা পার্টি ভাগের প্ররোচনা দিয়ে যাচ্ছিলেন।' (পৃ ১৯, অকটোবর ও পেরেস্ত্রোইকা, বহমান বিপ্লব, এনপিএ পাবলিশিং হাউস, মস্কো ১৯৮৭) গোরবাচেভ ওই বিভেদকামী নেতা হিসেবে প্রধানত ত্রৎস্কি এবং পরে জিনোভিয়েভ-কামেনেভের নাম করেছেন। তারপর বলেছেন, 'সংক্ষেপে বলতে হয়, পার্টির নেতৃস্থানীয় মূলাংশ যোসেফ স্তালিনের নেতৃত্বে আদর্শগত সংগ্রামে লেনিনবাদকে রক্ষা করেছেন। ঐ মূলাংশ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের প্রাথমিক স্তরে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করে। এর রাজনৈতিক ধারা পার্টির অধিকাংশ (most) সদস্য এবং অধিকাংশ (most) শ্রমজীবী জনগণের দ্বারা অনুমোদিত হয়। ত্রৎস্কিবাদকে আদর্শগতভাবে পরাজিত করার ক্ষেত্রে নিকোলাই বুখারিন, ফেলিক্স জারজিন্স্কি, সের্গেই কিরভ, গ্রিগরি অরজোনিকিজ, যান রাজুতাক ও অন্যান্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।' (ঐ, পৃ ২০-২১) [গুরুত্ব আরোপ আমার]

আসলে তপনবাবু বা তাঁর মতো দৃষ্টিভঙ্গির মানুষদের সমস্যা হল তাঁরা বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের চোখে ইতিহাস বিচার করেন এবং ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে সঠিক প্রেক্ষাপটে দেখতে ব্যর্থ হন। যোসেফ স্তালিন বা যে-কোনো ব্যক্তিই হোন, তিনি তাঁর নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালে একটি শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। প্রয়োজনে সমস্বার্থের অন্য শ্রেণীর সঙ্গে মঞ্চ স্থাপন করলে তার নেতৃত্ব সেই ব্যক্তি দিতে পারেন, কিন্তু তা-ও একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে। যেসব ঐতিহাসিক ব্যক্তি বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি, তাঁরা আক্রান্ত হতে পারেন বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াদের দ্বারা। তপনবাবুর কাছে প্রশ্ন—যোসেফ স্তালিন কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন? তাঁর মোহজালসৃষ্টির প্রয়োজন হবে কেন? বিপরীতক্রমে দেখা যায়, তিনি আগাগোড়া লেনিন ও লেনিনবাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। বাস্তব ঘটনা হল এই যে, লেনিনকে অভ্রান্ত ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করার মানসিকতার পেছনে স্তালিনের দৃঢ়সঙ্কল্প লড়াই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি মন্তব্য নিয়ে তপনবাবুর উক্তি আলোচ্য হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, লেনিনের টেস্টামেনট যখন উত্থাপিত হয় তখন স্তালিনের ক্ষমতা ও সাহস ছিল না বলে তিনি লেনিনের বিরুদ্ধে যান নি। আমি বলেছিলাম 'ক্ষমতার তুঙ্গে' থেকেও লেনিনের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলেন নি। তপনবাবু, স্তালিন কি সেই সময় ক্ষমতার তুঙ্গে ছিলেন? কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে? তখনও বলেন নি। বলেন নি যে, তার কারণ তাঁর সাহস বা ক্ষমতার অভাব নয়। না বলার কারণ, লেনিন তাঁর কাছে ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর তাত্ত্বিক নেতা ও বিপ্লবী মার্কসবাদের সার্থক পতাকাবাহক। স্তালিন নিজেকে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ মনে করতেন, একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে মনে করতেন, আর জানতেন শ্রেণীশত্রুর প্রতিই হিংসাত্মক আক্রমণ করতে হয়, তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে হয়—স্বশ্রেণীর কোনো তাত্ত্বিক বা নেতার ভাবমূর্তির ওপর হামলা করলে শত্রুরাই উপকৃত হয়। একমাত্র পেটি-বুর্জোয়া কালা-

পাহাড়েরা 'মোহজাল' ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে শ্রেণীশত্রুদের সাহায্য করার জন্য 'গণতান্ত্রিক' হয়ে বিপ্লবী নেতৃত্বের ভাবমূর্তি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

তপনবাবু যে পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা কী পরিমাণে আক্রান্ত তা বোঝা যায় তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্যে : 'একথা ঠিক যে, লেনিন যদি পার্টির অভ্যন্তরে উপদল নিষিদ্ধ না করতেন, পার্টির মধ্যে সেক্রেটারিয়েট, অর্গব্যুরো, পলিটব্যুরো প্রভৃতি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করতেন, তাহলে স্তালিনের পক্ষে পার্টির অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ হয়তো সম্ভব হত না,…' ইত্যাদি। (পৃ ৩৪২) আরো ভালো হত লেনিন যদি পার্টি-গঠনতন্ত্র রচনা না করতেন, পার্টির সাংগঠনিক তত্ত্ব হাজির না করতেন, পার্টি গড়ে না তুলতেন, সর্বোপরি পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবটা না করতেন! তাহলে নিশ্চিন্ত থাকা যেত। স্তালিন-নামক মানুষটিই ক্ষমতায় আসতেন না। পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা কত আরামে বিপ্লবের বিতর্কসভা চালিয়ে যেতে পারত! তবু যাই হোক, 'আমাদের' লেনিন নিজের দোষ সংশোধন করে-ছিলেন কী নাকি সব গণতন্ত্র রাখার চেষ্টা করে। বেচারি ভ্লাদিমির ইলীচ! কী যে সব করে গেছেন আপনি!

দেখা যাক, পার্টি, গণতন্ত্র বা কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে লেনিন কী বলে গেছেন।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে লেনিন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে পার্টি ঐক্যের ওপর একটি প্রস্তাব রচনা করেন। সেখানে পার্টি ঐক্যের প্রসঙ্গে তিনি যেসব ব্যবস্থার কথা বলেছেন তা কিন্তু মূলত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা ও বিরোধী উপদলীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারই প্রস্তাব। ওই কংগ্রেসের জন্য রচিত আরেকটি খসড়া প্রস্তাবে লেনিন সিনডিক্যালিস্ট ও নৈরাজ্যবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'আদর্শগত সংগ্রামের অত্যন্ত দৃঢ় ব্যবস্থার এবং পরিশুদ্ধিকরণ ও পার্টির স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার' আহ্বান দেন। সেখানেই লেনিন বলেন, 'দ্বিতীয়ত পার্টির বাইরের জনগণের ওপর নির্ভর করা, তাদের সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকি করা, যেমনটি উপরে উদ্ধৃত তত্ত্বে বলা হয়েছে, মার্কসবাদ থেকে কোনো অংশে কম সরে যাওয়া নয়।' আবার ১৯২১ সালের ২৮ সেপটেম্বর তারিখে লেখা "পার্টি পরিশুদ্ধিকরণ" ইস্তাহারে তিনি লিখেছেন, 'অবশ্যই জনগণ যা বলে তার সবকিছুই আমরা মেনে নেব না। কেননা অনেক সময় জনগণ এমন ভাবাবেগের কাছে নরম হয় যা কোনোমতেই অগ্রবর্তী নয়। বিশেষ করে সেই সব সময়ে যখন অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়ে।'

পার্টিশৃঙ্খলা ও কেন্দ্রিকতার ব্যাপারে লেনিনের মনোভাব বিভিন্ন লেখায় ব্যক্ত হয়েছে। রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে বিপ্লবের আগে আর পরে লেনিনই পেটি-বুর্জোয়া "গণতান্ত্রিক অধিকারের" দাবির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন। বিপ্লবোত্তর কালে পাঁচ বছরের গৃহযুদ্ধের সময়ে ত্রৎস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়ে-ভকামেনেভ প্রমুখ পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের সঙ্গে-সঙ্গে পার্টিতে তাঁদের কোণঠাসা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লেনিন নিতে শুরু করেন। কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরে লেনিনবাদী শক্তি এতটা সংহত ছিল না যে ওইসব বিভেদকামীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন, 'তীব্র গৃহযুদ্ধের এই কালে কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্তব্য পালন করতে পারবে যদি তাকে অত্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত করা হয়, যদি তার মধ্যে প্রায় সামরিক শৃঙ্খলার মতো লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা থাকে এবং যদি তার পার্টিকেন্দ্র শক্তিশালী ও

ক্ষমতাবান সংগঠন হয়, যার হাতে থাকবে ব্যাপক ক্ষমতা এবং যে পার্টি-সদস্যদের সর্বজনীন আস্থা ভোগ করবে।' (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে ঢোকার শর্তাবলী)।

বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনে লেনিন পার্টিকে কতখানি "গণতন্ত্র" খর্ব করার ক্ষমতা দিতে রাজি ছিলেন তা বোঝা যাবে আরেকটি উদ্‌ধৃতি থেকে : 'ইতালিতে, সবাই স্বীকার করেন, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক লড়াই আসন্ন। এমন সময়ে পার্টি থেকে মেনশেভিক, সংস্কারবাদী, তুরাতিপন্থীদের সরিয়ে ফেলা শুধু একান্ত আবশ্যক তাই নয়, প্রয়োজনে যেসব চমৎকার কমিউনিস্ট দোদুল্যমান হবেন তাঁদেরও সরিয়ে ফেলা কাজের হবে এবং যাঁরা সংস্কার-পন্থীদের সঙ্গে 'ঐক্যের' দিকে ঝুঁকবেন তাঁদের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার…। বিপ্লবের প্রাক্-মুহূর্তে এবং যে সময় এর বিজয়ের জন্য তীব্র সংগ্রাম চলছে তখন পার্টি র‍্যাংকে সামান্য-তম দোদুল্যমানতা **সব কিছু বরবাদ** করে দিতে পারে, বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে পারে, প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে; কেননা ক্ষমতা এখনও সংহত হয় নি, তার ওপর আক্রমণ খুব জোরদার। এরকম সময়ে দোদুল্যমান নেতারা সরে গেলে পার্টি দুর্বল না হয়ে শক্তিশালী হয়, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও বিপ্লব শক্তিশালী হয়।' (ইতালীয় সমাজতন্ত্রী দলের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম প্রসঙ্গে, নভেম্বর ১৯২০)।

স্তালিনের "লেনিনবাদের ভিত্তি" শীর্ষক বক্তৃতামালার অষ্টম বক্তৃতা ছিল পার্টির ওপরে। সেখানে তিনি পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট ও তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে পার্টি সংক্রান্ত লেনিনবাদী নীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিপ্লবী পার্টির চরিত্র কী হওয়া উচিত, তার ব্যাখ্যা এর চেয়ে ভালো কিছু আমাদের সামনে নেই। তবে যাঁরা চাচীর ব্যঞ্জনে (তরকারিতে) জাগায়-জাগায় (স্থানে-স্থানে) ঝাল দেখেন তাঁরা ঐ বক্তৃতার মধ্যে দারুণ 'মোহজাল' সৃষ্টির ক্ষমতা আবিষ্কার করবেন আর ত্রৎস্কির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবেন—ওঁর কোনো যোগ্যতা ছিল না, সাহস ছিল না, ক্ষমতা ছিল না, বুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান ছিল না, তবু লেনিনের কৃষি- ও শিল্পনীতি কার্যকর করে মানুষকে বুদ্ধু বানিয়েছে। গোটা সোভিয়েত পার্টি ও জনগণ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশ্বশ্রমিক আন্দোলন লোকটার মোহজালে এমন জড়িয়ে পড়েছিল যে সারা পৃথিবীর চেহারাটাই মাত্র ২৯ বছরে বদলে দিল! তপনবাবু, একজন নিপীড়িত ভারতবাসী হিসেবে প্রার্থনা করছি—এমন একজন খারাপ, মোহজালসৃষ্টিকারী মানুষ আমাদের দেশে এনে দিন না!

স্তালিন-বিরোধিতার এখন সুবিধা হল ওঁর লেখাগুলো না পড়ে যে-কোনো অভিযোগ ওঁর নামে করে বসা যায়। আমার লেখার প্রথমেই যে উদ্‌ধৃতি দিয়েছিলাম সেটি তপনবাবু পড়েন নি। অথবা ধরতে পারেন নি। আমি তাঁকে অনুরোধ করব, ওই উক্তির মধ্যে যে 'মোহজাল' আছে তা ছিন্ন করে গভীরে যেতে। তাহলে উনি বিচ্ছিন্নভাবে ক্যাডাররাই সব নির্ধারণ করে বা জনগণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়গুলো নতুন করে ভাবতে পারবেন।

তপনবাবু যুক্তির নামে যেসব আধসেদ্ধ ভাত হাজির করেছেন সেগুলোর উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। "সাবৎনিকস" কেন গঠিত হয়েছিল বা সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রামের পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে উনি যদি লেনিন আর স্তালিনের রচনা পাশাপাশি রেখে দেখেন, তাহলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে একটা প্রশ্ন না তুলে পারছি না—সেটা হল : উনি বলতে চেয়েছেন বিপ্লবোত্তর যুগে লেনিন শ্রেণী-

সংগ্রামের ওপর জোর দিয়েছিলেন, স্তালিন সেটা স্বীকার করেন নি। তিনি লিখেছেন, 'বিপ্লবোত্তর যুগে লেনিন যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, স্তালিন সেখানে বিভিন্ন বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রেণীর উপস্থিতির ও শোষকশ্রেণীর অবলুপ্তির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এই সময়কার সমাজের এক নতুন অর্থ সংযোজিত করেন।' (পৃ ৩৪১) উরেঃ সর্বনাশ! পশ্য, পশ্য! অগণতান্ত্রিক যোসেফ স্তালিন কতখানি সংশোধনবাদী! লেনিন সমাজতন্ত্রের বাস্তব ভিত তৈরি না হতে যে শ্রেণীসংগ্রাম দেখেছিলেন, সেই লেনিনের কৃষি- ও শিল্পনীতি কার্যকর করে সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করেও স্তালিন শ্রেণীসম্পর্কের পরিবর্তিত চেহারা দেখে ফেললেন! তাহলে গোরবাচেভ কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ সমগ্র সঙ্ঘ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় যা বলেছেন তাকে তপনবাবু কী বলবেন? তাহলে উনি গোরবাচেভ সম্পর্কে আমার কথা মানতে পারছেন না কেন? তপনবাবু, একটা উক্তি দি। দেখুন এর মধ্যে কী 'মোহজাল' আছে। 'কমরেড স্তালিনের রিপোর্টে (সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত) আদর্শগত রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। তিনি পার্টিকে সতর্ক করে দেন যে যদিও তার শত্রুরা, সুবিধাবাদীরা এবং সকল রঙ ও বর্ণের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতরা পরাজিত হয়েছে তথাপি তাদের আদর্শের অবশেষ কিছু পার্টি-সদস্যের মনে টিকে আছে, এবং প্রায়ই তা জোরের সঙ্গে উত্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক জীবনে ধনতন্ত্রের টিঁকে থাকা এবং বিশেষ করে মানুষের মনে টিঁকে থাকার ফলে পরাজিত লেনিনবাদ-বিরোধী উপদলগুলির আদর্শের পুনরুজ্জীবনের অনুকূল মাটি রয়ে গেছে। জনগণের মানসিকতার বিকাশ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে তাল রাখে না। তার ফলে মানুষের মনে বুর্জোয়া ধ্যানধারণা বেঁচে আছে এবং সেটা থাকবে যদিও অর্থনৈতিক জীবনে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, চারিপাশের ধনতান্ত্রিক জগৎ যার বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র শানিয়ে রাখতে হবে, ঐ (বুর্জোয়া ধ্যানধারণার) অস্তিত্ব পুনরুজ্জীবনের ও দ্রুততর করে তোলার জন্য কাজ করছে।' (সিপিএসইউ (বি)-র ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পাঠ, পৃ ৪৯১-৪৯২)

বৃক্ষ, তুমি কে? ফলেই পরিচয়। বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-মাও অবিচ্ছেদ্য ও পরস্পরের পরিপূরক ধারা। উনত্রিশ বছর সোভিয়েত পার্টি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে এবং লেনিনের সার্থক পতাকাবাহক হিসেবে স্তালিনের নেতৃত্বে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে গৃহযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ (১৪টি দেশ মিলে), অন্তর্ঘাত ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রক্ষা করেছে, জনগণের 'পশ্চাৎপদতা' ও 'মোহজালের' সুযোগে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত গড়ে তুলেছে, একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জগৎ সৃষ্টি করেছে, দেশে-দেশে শ্রমিক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিকাশ ঘটিয়েছে, এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রকে কোণঠাসা করেছে। সেই 'অগণতান্ত্রিক', 'আদর্শগতভাবে ভ্রান্ত' স্তালিনের মৃত্যুর পর ৩৬ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত নড়বড়ে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিপন্ন, জাতি-দাঙ্গা ও জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতায় আবিল জাতিসম্পর্ক, য়োরোপীয় ও এশীয় জাতিগুলির প্রতি দ্বিমুখী নীতি, সোভিয়েত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্মানহানি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন খণ্ডবিখণ্ড, শ্রমিক আন্দোলন হয় ধুঁকছে নয় সুবিধাবাদী, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন আক্রান্ত, সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্রের বেঁচে-থাকার স্বপ্নের পুনরুজ্জীবন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আদর্শগত ঐক্য ছিন্নভিন্ন এবং গোরবাচেভের আবির্ভাবের পর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ওপর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের

সুবিধাবাদীদের চেয়েও ভয়ঙ্কর আদর্শগত হামলা শুরু হয়েছে। যাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং শোষণমুক্ত মানবসমাজের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের কাছে এ এক মর্মান্তিক পরিস্থিতি। সেই কারণে যোসেফ স্তালিন নামটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক ধারার প্রতীক, ইতিহাসের এক রাষ্ট্রপ্রধানের নাম নয়। লেনিন তাঁর " 'বামপন্থী' কমিউনিজম, একটি শিশুসুলভ উচ্ছৃঙ্খলা" গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রলেতারিয়েতের পার্টির লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা যে দুর্বল করবে (বিশেষত তার একনায়কতন্ত্রের কালে) সে বস্তুতপক্ষে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সাহায্য করবে।'

সামান্য একটু বদলে বলা যায়—সাম্রাজ্যবাদ. ধনতন্ত্র ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যুগে যাঁরা যোসেফ স্তালিনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত মুক্তিকামী জনগণের শত্রু এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক।

ক্রিয়াপদের বানান

বর্তমান অনুজ্ঞা

ধাতুর উত্তর ও-বিভক্তি যুক্ত হবে। যেমন :

এখন আমারে লহো করুণা করে। [লহ নয়]
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী। [বল নয়]
আমার পরানে যে গান বাজাবে সে গান তোমার করো সায়।
[কর নয়]
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে। [এস নয়]
অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায় রেখো না বসায়ে। [রেখ নয়]

নিত্যবৃত্ত বর্তমান : মধ্যম পুরুষ

ধাতুর উত্তর অ-বিভক্তি যুক্ত হবে। যেমন :

আঁধার হলে সাঁঝের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে। [আনো নয়]
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে। [করো নয়]
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি। [রাখো নয়]

বাঙলা-সংস্কৃতের বন্ধন প্রসঙ্গে

সুনীল সেনগুপ্ত

গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম বাঙলার শিক্ষাজগতে সংস্কৃতের স্থান নিয়ে একটা বিতর্ক উঠেছে। এবং তাই নয়, এর জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দল রাস্তায় নেমেছেন পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের সংস্কৃতনীতির প্রতিবাদে। ইস্কুল থেকে শুদ্ধ শুভ্র অথবা পট্টবেশ আর উপবীত-ধারী পণ্ডিতেরা তো অনেক দিনই বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের জায়গায় যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্যানট-শার্ট-পরিহিত পণ্ডিতেরা এসে জায়গা করে নিয়েছিলেন। হঠাৎ কী এমন কারণ ঘটল যে সংস্কৃতকে ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল? এতে ইস্কুল-কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার উপর জোর কমিয়ে দেওয়ায় চাকুরিজীবী বাঙালি তাঁর প্রথাগত জ্ঞানের ভাণ্ডার সংস্কৃত শিক্ষার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এখন এখানে চাকুরির প্রশ্ন, সংস্কৃতজ্ঞানী পণ্ডিতদের অর্থ- ও অন্ন-সংস্থানের ব্যাপারে সরকারি দক্ষিণা তেমনভাবে বর্ষিত হবে না। তাই প্রশ্নটা একটু নেপথ্যে চলে গিয়েছে। প্রশ্ন ওঠা উচিত ছিল—বাঙলা শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ কতখানি, এর প্রয়োজনীয়তাই বা কতখানি। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি ছাত্রকে ভাগ করা হত হিন্দু আর মুসলমানে। আর শিক্ষানীতিতে সংস্কৃত পড়তে যেত হিন্দুর ছেলে-মেয়েরা, আর আরবি-ফারসি পড়ত মুসলমানের ঘরের ছাত্রছাত্রীরা। ব্যাপারটার মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিকতার বালাই ছিল না, আর সেই নীতি ধরে ব্রাহ্মণের বা ব্রাহ্মণত্বের দাপটে মুসলমানের ছেলে-মেয়ে, খ্রীষ্টান ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংস্কৃত কলেজের হেঁসেলঘরে ঢোকার সুযোগ ছিল না। এ নিয়ে কিছু কাহিনী আছে। এসব যে সত্যি তাও সকলেরই প্রায় জানা। ভাষাতত্ত্ববিদ মহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন প্রথাগত শিক্ষার বাইরে। বর্তমানের একজন প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যও নানারকম অসুবিধা অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন প্রশ্ন হল—কেন সংস্কৃত শেখার জন্য এঁদের এত লড়াই? সংস্কৃতের জ্ঞানের উৎস কতটা কার জন্য খোলা থাকবে—সেকথা কি সরকার একটা ব্যাপক আলোচনা করে করেছিলেন? আরও বড়ো প্রশ্ন: বাঙলা ভাষায় জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য সংস্কৃতের কতটা প্রয়োজন? এটা কি শুধু ফারসি-আরবির মতো একটি ধ্রুপদী ভাষা, যা হিন্দু আর মুসলমানের ধর্মের সীমানায় এসে আটকে যায়? এসব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য প্রয়োজন ছিল ভাষাবিজ্ঞানীদের এই আলোচনায় যোগদান করা। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার স্থান নির্দেশ করা। আর সেই স্থাননির্দেশে দরকার ধর্মের উর্ধ্বে উঠে একটা বৈজ্ঞানিক বক্তব্য উপস্থিত করা। আমার এই প্রবন্ধে সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না। অতি সংকোচে বলতে হচ্ছে, সংস্কৃত আর বাঙলার সম্পর্ক নিয়ে বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের মতামত আর তত্ত্বকে অনুসরণ করে আমাদের কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যেখানে ভাষার গড়ে ওঠা, সৃষ্টিকথা সত্যি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়। এর সুবিধা অনেক, যা প্রতিটি বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি হয়। আর তা ছাড়া, সংস্কৃতকেও মুক্ত করতে হবে ধর্মের বেড়াজাল থেকে। সংস্কৃত, ফারসি, আরবি, তুরকি, তারপর পরতুগিজ, ইংরেজি ভাষাসমূহের সঙ্গে আধুনিক বাঙলার সম্পর্কনির্ণয় আমাদের প্রয়োজনেই করা দরকার। তবে এ আলোচনার পরিধি অতদূর বাড়ালে আমরা সংস্কৃত আর বাঙলার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা থেকে দূরে সরে যাব। তা ছাড়া, কোনো ভাষাই তো চিরদিনের জন্য একই বন্ধনে থাকতে পারে না। তাই এই প্রশ্নের জবাব বাঙলা ভাষার মুক্তির প্রয়োজনেই আসবে। রবীন্দ্রনাথের এ নিয়ে সুচিন্তিত চিন্তা দু-এক জায়গায় আপাতপরস্পরবিরোধী হলেও দুই ভাষার সম্পর্কের একটা দ্বান্দ্বিক ঐক্য তিনি তুলে ধরেছেন। আমার আলোচনা ওঁর মতামতের রেশ ধরে। একটা কথা এখানে আগেভাগেই বলে নেওয়া ভালো—ভারতীয় ভাষাসমূহ, এমনকী দক্ষিণী ভাষা-সমূহ নাকি সংস্কৃত থেকে জন্মেছে—এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক অথচ লৌকিক বিশ্বাস বিশেষ পরিব্যাপ্ত, বহু অন্য বিষয়ের পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত—তা আমরা প্রথমেই খারিজ করছি। কারণ তা আলোচনার মানকে অতি নীচে নামিয়ে আনবে। আর আমরা এখানে সংস্কৃতকরণের (Sanskritization) বক্তব্যের বিরোধী প্রাকৃতীকরণ (Naturalization) তত্ত্বের অবতারণা করব। প্রথমটির মধ্যের ভুল ধারণাটিই উপরোক্ত অবৈজ্ঞানিক বক্তব্যের ভিত্তি।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধারণা

ভারতীয় ভাষাধারণায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত—এই দুইটি কথার (সংজ্ঞা) স্থান দুই কোটিতে। বিভিন্ন যুগে এই নিয়ে একদিকে যেমন নানারকম বিভ্রান্তি আর দ্বন্দ্ব হয়েছে, তেমনি সমাজের মধ্যে ভাষার কাজ বা ক্রিয়াশীলতার প্রশ্নে ভাষাব্যবহারের রীতিকে চিহ্নিত করাও এই দুইটি পদের মধ্য দিয়ে হয়েছে। বর্তমান যুগের এক প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস ফার্গুসনের নামে প্রচলিত ডাইগ্লসিয়া (Diglossia) বা দ্বিভাষা-রীতিতত্ত্ব বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ভাষার ব্যবহারকে চিহ্নিত করার জন্য। প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানী-দের কতকগুলি সুবিধা ছিল, যার ভিত্তিতে তাঁদের ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণশাস্ত্র একটা বৈজ্ঞানিক চরিত্র পেয়েছে, আর যা আজকের মাপকাঠিতেও ক্ষুণ্ণ হয় নি। এঁদের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হল—এই দেশটা প্রাচীনকাল থেকেই বহুভাষার দেশ। এই বহুভাষা ব্যাপারটা কিন্তু কোনো একভাষা আর তার শাখা-প্রশাখায় গড়ে ওঠে নি, যেমনটা ইউরোপের ক্ষেত্রে হয়েছে। (ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই রঙিন চরিত্রটাই আয়ত্তে আনতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়—এমনকী বংশধারণায়। নির্জল, নির্মল একজাতি-

ভিত্তিক মিশ্রণটা পছন্দও করেন না, বোঝেনও না।) ভারতবর্ষে বিশেষ-বিশেষ ভাষাগোষ্ঠী ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের ভাষা নিয়ে এখানে এসে মিলেছেন, মিশেছেন। এর ফল যা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা পরে করব। এখানে যে কথা বলার জন্য এই বিষয়টি পাড়ছি, সেটা হল—এই বহুভাষিকতাও এদেশে ভাষাবিজ্ঞানীদের সুযোগ দিয়েছে এক ভাষার সঙ্গে একাধিক অপর ভাষার তুলনা করতে এবং এক ভাষার সঙ্গে তাঁদের সমাজের ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করতে। এই সম্পর্কনির্ণয়ে এক ভাষাগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে আর বাইরে প্রাকৃত আর সংস্কৃত বলে ভাষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একে আমরা দ্বিভাষারীতি বলব কিনা জানি না, আর তাতে ফারগুসনের তত্ত্বের মূল্য সামাজিক ভাষাবিজ্ঞানের অবদানে হয়তো কমবে না। তবে এঁদের এই নামকরণ ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীদের মর্যাদাকে নিঃসন্দেহে বাড়াবে। কোনো তত্ত্বের কার্যকারিতার উপর তার ও তার মাননির্ণয়ে আসলে গর্ববোধ ইত্যাদি না থাকাই ভালো। (বাঙলা ভাষাতেও এই ধরনের ব্যবহারীতি নিয়ে ফারগুসনের তত্ত্ব অনুসরণ করে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে মনে রেখে, বর্তমানে দুই পরিচিত ভাষাবিজ্ঞানী ঢাকা শহরের মনসুর মুসা, আর কলকাতার [বর্তমানে হায়দ্রাবাদের] উদয়নারায়ন সিং একটি কাজও মিলিতভাবে করেছেন। সেখানে তাঁদের আলোচ্য বিষয় সাধু আর চলিত ভাষার রীতি এবং রূপ। এঁদের এখানে উল্লেখ পাঠকদের অনুসন্ধিৎসার দিকে লক্ষ্য রেখে।) বহুভাষিত দেশের ভাষাপ্রকাশব্যবস্থায় (language communication system) একটা জরুরি কথা হল—প্রয়োজনের তাগিদে ভাষার দ্বিতীয় স্তরে অন্য একটি ভাষাপ্রকাশমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। বহুভাষিক ভাষাপ্রকাশব্যবস্থার স্তরভেদকে একটু বিস্তৃত করলে দেখা যাবে—এখানে কেবল দুই কোটিতে ভাষা গড়ে ওঠে না, স্তরভেদও দুইয়ের বেশি হতে পারে।

[উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জামশেদপুর শহরটা শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে ওঠার ফলে সেখানে ভাষা-প্রকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রতিটি ভাষার অভ্যন্তরে বহুভাষিত অবস্থার জন্য নানা ভাষাপ্রকাশগোষ্ঠী (linguistic communication community) তৈরি হয়েছে। তাদের চরিত্রে সাময়িকতা আর স্থায়িত্ব দুইই রয়েছে। যেমন ধরুন সাকচির শিক্ষিত বাঙালি নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় বাঙলা ব্যবহারই ভালোবাসে, সেই বাঙালি টেলকো বা অন্যত্র চাকুরির সুবাদে সমমর্যাদার অবাঙালির (পানজাবি, তামিলি, বিহারী, ওড়িয়া ইত্যাদি) সঙ্গে ইংরেজির মাধ্যমেই বলার কাজটা চালিয়ে নেয়, লেখার কাজটা তো বটেই। (খুব অল্পক্ষেত্রেই, লেখার ক্ষেত্রে কখনোই নয়) হিন্দি নামে বিশুদ্ধ ভাষারীতি ব্যবহার করার চেষ্টা করে।] সেই বাঙালিই আবার কারখানাঘরের কাজ নিয়ে যন্ত্রপাতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী থেকে আসা শ্রমিকদের সঙ্গে নিজের জানা বা শিখে-নেওয়া বাজারি হিন্দি ব্যবহার করে। সেই একই ঘটনা ঘটে ঘরে ফিরে এসে সাকচির বাজারে দোকানদারের সঙ্গে দরকষাকষিতে। বাঙালি শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে প্রধানত হিন্দির বাজারি রূপটাই ব্যবহার করে। আর আদিবাসী সম্প্রদায় যাঁরা এই এলাকার গ্রামে বাস করেন তাঁরা আজও দ্বিভাষিকতায় বাঙলা ব্যবহার করেন। অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীতে বিশেষ করে সাঁওতালি, হো, মুণ্ডারি, কুরুখ-ভাষীদের সঙ্গে সাদরি, অনেকক্ষেত্রে বাজারি হিন্দি ইত্যাদি ব্যবহার করে। বহুভাষিত ভাষাপ্রকাশব্যবস্থায় এই ত্রিস্তর ভাষাসৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেছি, বিভিন্ন সময়ে।

একটা কথা এখানে বলা হয়তো বেমানান হবে না—আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকাব্যে কালিদাস ও অন্যান্য কবিরা সমাজের ত্রিস্তর ভাষা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

প্রাকৃত ভাষা কী — তার সংজ্ঞা

প্রাকৃতভাষা কাকে বলে, প্রাকৃতভাষা বলতে আমরা কোনো নির্দিষ্ট ভাষা বুঝি কিনা—এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আর এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথও যোগদান করেছেন। প্রাকৃত কথাটার এইখানেই তাৎপর্য। প্রশ্ন উঠেছে: বাঙলা বা কোনো আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা কি প্রাকৃতভাষা, না মধ্যভারতীয় আর্যভাষার একটি বা একাধিক রূপ হল প্রাকৃত? দুটোই সত্যি। তবে এসবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সংস্কৃতের সঙ্গে দৈনন্দিনের ভাষাপ্রকাশব্যবস্থায় ব্যবহৃত ভাষার পার্থক্য টানার চেষ্টা। সমাজের দুই স্তরে কথ্যভাষা ও লিখিতভাষার রূপকেও যে প্রাকৃত আর সংস্কৃত বলা যায় সে কথাও আলোচিত হয়েছে।

'যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাংলা শব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে জুড়িয়া ব্যবহার করা হয়, যদি লিখিত বাংলাকে 'সংস্কৃত বাংলা' ও কথিত বাংলাকে 'প্রাকৃত বাংলা' বলা যায় তবে আমরা আপত্তি করিতে পারি না।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলা শব্দতত্ত্ব পৃ ২৩৯-২৪০)। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথা বলার পরও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাকে পৃথক পৃথক ভাষা বলেছেন, এবং একই ভাষার দুই রূপ বা রীতি নয়। প্রাকৃতভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিই তার বড়ো প্রমাণ। এখানে প্রাকৃত বলতে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার একটি বা একাধিক রূপের নামকরণ বোঝাচ্ছে।

প্রাকৃত কথাটি বাঙলা সাহিত্যে বাঙলা ভাষাকে বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাকৃত কথাটি যে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ অর্থবহ, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটি একটি মূল্যবান সংযোজন। প্রাকৃতভাষার বৈয়াকরণেরা—বররুচি, কাত্যায়ন, হেমচন্দ্র ও অন্যান্যরা ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের শক্তিশালী ঐতিহ্যকে বজায় রেখে ভাষা সম্পর্কিত কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন; বর্তমান ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে, ভাষার রূপান্তর, উদ্ভব ইত্যাদি বিষয়ে তা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এক ভাষার সঙ্গে অন্য-ভাষার সংস্পর্শ (contact) ভাষাপ্রকাশব্যবস্থায় ভাষার মধ্যে কী পরিবর্তন আনে, তার উপর জোর দিয়ে বিশেষ কাজ করা হচ্ছে। সেই গবেষণার বিভিন্ন ফলের ভিত্তিতে প্রাকৃত বৈয়াকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনার বিচার এবং মূল্যায়ন করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। তবে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের বংশপঞ্জীনির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছু নতুন ধারণা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন হবে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের ধারণাটি আমরা পেয়েছি মূলত ইউরোপীয় সূত্রে—স্যার উইলিয়ম জোনসের বক্তব্য কলকাতার মাটিতে হলেও সেটা ইউরোপীয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রগতির ভিত্তিতে, সেই সূত্র ধরে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার (বা প্রাকৃত বাঙলার) বন্ধনের চরিত্রনির্ধারণ নতুন করে ভাবা দরকার। (কোয়েরবার, বোয়াস, হাইম, অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানী, ও বর্তমান লেখকের ভাষার উদ্ভব বা গড়ে ওঠার প্রশ্নের উপর আলোচনা এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য)।

ভাষার রূপান্তর-প্রশ্ন: এক ভাষিত ও বহু ভাষিত ক্ষেত্র

ভারতবর্ষ সামগ্রিকভাবে বহুভাষিত দেশ হলেও এর সমস্ত এলাকাকে আমরা বহুভাষিত বলে ধরতে পারি না। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর এলাকার কথা ছেড়ে দিয়েও, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আজও বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, সেখানে তাদের অপর ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলন আর মিশ্রণের কোনো সুযোগ থাকে না। ভারতবর্ষকে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের দিক দিয়ে বহুভাষিত দেশ বলাই সঠিক। যে কোনো বহুভাষিত

গোষ্ঠীর (multilingual community) কাছে সুযোগ থাকে এক ভাষার বহু অপর-ভাষার সম্পর্কে আসার। বহুভাষিত গোষ্ঠী বলতে আমরা কী বুঝি? এখানে প্রয়োজন হবে ভাষাবিজ্ঞানে প্রচলিত সংজ্ঞার সঙ্গে এর পার্থক্য তুলে ধরা। অনেকে বহুভাষিককে দ্বিভাষিকতার সঙ্গে এক করে দেন। ওয়াইনরাইখ (১৮৬৮-১৯৫৩ Language in Contact, The Hugue) তাঁর বহুভাষিকতার (multilingualism) ধারণায় দ্বিভাষিকতা ও দ্বিভাষিককে এক করে দেখেছেন। (তেমনি দেখছেন, হেরমান, ফার্গুসন, জেল হাইম ও অন্যান্যরা)। এখানে তাঁরা ব্যক্তি-মানুষের (বা গোষ্ঠীমানুষের) ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন কারণে দুটি ভাষা ব্যবহারকে দ্বিভাষিকতা ও বক্তাদের দ্বিভাষিক বলে দেখেছেন। তাঁর কাছে দ্বিভাষিকতা আর বহুভাষিকতার চরিত্র এক।

ফার্গুসনের ধারণাতেও* প্রায় এক বক্তব্যে বহু-ভাষিত ও বহুভাষিকতার মধ্যে পার্থক্য তেমন করে বিশ্লেষণ করা হয় নি। আমাদের বহুভাষিকতার আলোচনায় কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর উপর জোর দিচ্ছি না। (কোনো একক ব্যক্তি দুইয়ের অধিক ভাষা শিখে ব্যবহার করে—তাকে বহুভাষিক বলাই শ্রেয়।) কোনো ভাষাগোষ্ঠী সামাজিক ও ভাষাপরিবেশের চাপে যখন এক বা একাধিক ভাষার ব্যবহার করে বা শেখে, তখন তার ভাষাপ্রকাশের ইচ্ছায় আর প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে তার নিজগোষ্ঠীর ভাষার সম্পর্কসৃষ্টি হয়। এর চরিত্রও অন্য ধরনের। আমরা একেই বহুভাষিত ভাষাগোষ্ঠী বলে আখ্যা দিচ্ছি (multilingual linguistic community)। এখানে গোষ্ঠীটা একাধারে সামাজিক, এবং ভাষাগত সামাজিক অর্থে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পাশা-পাশি বহুভাষার লোকের উপস্থিতিতে প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সম্পর্ক রচিত হয়, আর এই সম্পর্কের মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতা সমাজে কাজ করে। এই সামাজিক পরিবেশটাকে একক গোষ্ঠী হিসেবে দেখাটাই সামাজিক বিশ্লেষণের পক্ষে সঠিক এবং প্রয়োজনীয়।

ইতিহাসে বহুভাষিত গোষ্ঠীর উদাহরণ আমাদের কাছে দুই রকমের। আর এই অবস্থার তেমন একটা হেরফের হয় নি। এক ধরনের বহুভাষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে একই ভাষাপরিবারের সৃষ্ট বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে। যেমন হয়েছে দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে, অথবা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে খুব সামান্য এলাকা বাদ দিলে সেখানে প্রতিটি ভাষা একই ভাষাপরিবারে একই শাখার অন্তরভুক্ত। এটা খানিকটা ইউরোপীয় ধরনের, যেমন রোমানিক ভাষা-শাখার ভাষাগুলি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েও নিজেদের মধ্যে মিল বজায় রেখেছে। এখানকার ভাষার উদ্ভব বা উন্নয়ন (রূপান্তর পর্যন্ত) উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা শাখা প্রশাখা ও নতুন চারার জন্মের মতো। এই বহুভাষিত গোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু এলাকার বহুভাষিত ভাষাগোষ্ঠীর তুলনা করা যায় না, কি ইতিহাসে, কি বর্তমানে।

ভারতবর্ষে আবহমান কাল ধরে বিভিন্ন ভাষা-পরিবারের সংস্পর্শে বহুভাষিত ভাষাগোষ্ঠী ও তার ক্ষেত্র বা এলাকা সৃষ্টি হয়েছে এবং নতুন ভাষা সৃষ্টি হয়েছে ভাষাপ্রকাশের ব্যবস্থার প্রয়োজনে। প্রয়োজনটা সামাজিক। উপরে আমরা বর্তমানে এই রকমের প্রক্রিয়াকে আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছি। শিল্পনগরী জামশেদপুরের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভাষার ত্রিস্তরের কথা তুলেছি। আমাদের আলোচিত

* 1971—Contrasting Pattern of Literacy acquisition in Multilingual Nation—in Language use and Social Change—Problems of Multilingualism with special reference to Eastern Africa, Ed. W. H. Whiteley, Oxford University Press.

এই দুই বহুভাষিত ভাষাপ্রকাশগোষ্ঠীর বাইরে আর-একটি মধ্যবর্তী বা তৃতীয় স্তর রয়েছে, যেখানে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা বহুভাষিত এলাকায় বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে আজও নানা নতুন ভাষাগোষ্ঠী ও তার ভাষা (সাদরি, কুরমালি, থোটে, পাঁচ-পরগনিয়া, নাগামিজ, ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়ে চলেছে। (এখানে সৃষ্টি কথাটা ব্যবহৃত হচ্ছে ভাষার উদ্ভব ও রূপান্তর বোঝাতে। ভাষাপ্রকাশব্যবস্থায় নতুন ভাষা গড়ে ওঠে, সৃষ্টি হয় কৃত্রিম ভাষা, পরাভাষা বা অন্য কিছু।) এই আলোচনার পর প্রাকৃত ব্যাকরণ-কারদের সিদ্ধান্তসমূহ অনুধাবন করলে বোঝা যাবে তাঁদের বিশ্লেষণের স্বচ্ছতা, আর তারই সঙ্গে প্রাকৃত-করণপদ্ধতিতে বাঙলা, মৈথিলী, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষার জন্ম।

বররুচি (৩৭৬-৪৬৪), কাত্যায়ন (আনুমানিক ৫০০-৬০০ মধ্যবর্তী), হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২), পুরুষোত্তম (১১১০-?) প্রমুখ বৈয়াকরণেরা বহুভাষিত ভাষাপ্রকাশগোষ্ঠীতে ভাষাপরিবর্তন লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টির ব্যাখ্যায় প্রাকৃতী-করণ-প্রক্রিয়াকে বোঝা যায় বহুভাষিত ভাষা-প্রকাশগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে। এরই জন্য তাঁদের পরিভাষায় ভাষার এক কোটিতে সংস্কৃত ও বিপরীতে প্রাকৃত। পরে অবশ্য ভাষাবিজ্ঞানের এই বৈজ্ঞানিক ধারণা পরবর্তী কালে সংস্কৃত বৈয়াকরণদের বক্তব্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে, এবং সঠিক বক্তব্যে ভেজাল চালানো হয়।

পরবর্তী কালে এরই ফলে একদিকে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জন্মে, ভারতে তার রোমান্তিকতায় আচ্ছন্ন আত্মতৃপ্তিতে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ভাষা-সৃষ্টির ব্যাপারে বহুভাষিত দেশে সমগ্র ভাষার রূপান্তরকে মিশ্র জৈবিক ধরনের প্রক্রিয়ার মতো না-দেখে একে প্রাজ্ঞিক ভাষাসৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করেন, এবং বাঙলা, মৈথিলী, ভোজপুরী, মাগধী, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বলে অভিহিত করেন। এতেও তেমন একটা ক্ষতি ছিল না যদি মিশ্রণের প্রক্রিয়টাকেও এই বিচারের মধ্যে ধরা হত। আগে যেমন সংস্কৃত পণ্ডিতদের নির্দেশে সবভাষার উৎস দেবভাষা সংস্কৃত, বর্তমানে তেমনি রাজশক্তির নির্দেশে মৈথিলী, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষাসমূহ হিন্দির বিকৃত রূপ বলে তত্ত্ব হাজির করা হচ্ছে। এ এক ভুল তত্ত্ব। ততোধিক মূর্খতা হল এই ধ্যানধারণাকে প্রচার করা। আমরা বৌদ্ধ ও জৈন প্রাকৃত ভাষা গবেষকদের অবদানকে এই দিক থেকে বিচার মূলত তিনটি কারণে মূল্যবান মনে করি:

১। প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা বহুভাষিক সংস্পর্শ ও তার আন্তঃক্রিয়া প্রক্রিয়া বুঝতে পারেন;

২। প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বহু-ভাষার মিশ্রপ্রক্রিয়াতে ধ্বনি, অভিধান, ও ব্যাকরণগত পরিবর্তন ধরতে পারেন এবং পারস্পরিক মিশ্রণ লিপিবদ্ধ করেন;

৩। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা বিভিন্ন ভাষাকে তার সামাজিক ব্যবহার ও ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে পাশাপাশি ও আড়া-আড়ি ভাবে পৃথকীকৃত ও স্তরীভূত করে বিশ্লেষণে সক্ষম হন।

মার্কণ্ডেয় প্রাকৃতভাষার চার বিভাগের (মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী) বাইরে তাদের ক্রিয়াশীলতাও নির্দেশ করেন। তাঁর বিভাগে ভাষা-প্রকাশগোষ্ঠীর সম্মানের বিভিন্ন স্তর নির্দিষ্ট হয়। মার্কণ্ডেয়র বিভাগের মধ্যে বিভাষা (বিদেশী/বিপরীতভাষা) পৈশাচী উল্লেখযোগ্য। বিভাষার অন্তরভুক্ত করা হয়েছে অসংস্কৃত ভাষাসমূহকে। মাগধী গোষ্ঠীর ভাষা সেখানে নিম্নবর্গের ভাষা। এই ভাষা ব্যবহার করে—রাক্ষস, ভিক্ষু, ক্ষপণক এবং দাস সম্প্রদায় বা/গোষ্ঠী। এঁদের নামকরণ বুঝিয়ে দেয় সমাজে এঁদের স্থান। এই মাগধী ভাষাগোষ্ঠীর

ভাষা মাগধী প্রাকৃত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নিম্নবর্গের অন্তর্গত।

প্রাকৃতের এই বিভাগ ও তার সমাজে স্থান নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে মগধ এলাকায় ভাষার আভিজাত্যে তাঁদের স্থান কোথায় ছিল তা দেখানো; নিম্নবর্গের মানুষের (স্থানীয় জনজাতিক গোষ্ঠীর ভাষার রূপান্তরপ্রক্রিয়া) মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হত বহুভাষিত ভাষা-প্রকাশক্ষেত্রে আদান-প্রদানের জন্য—সমাজের ব্রাহ্মণেতর মানুষের ভাষা-প্রকাশমাধ্যম। একেই প্রাকৃত বলা হয়েছে।

প্রাকৃত ভাষার তত্ত্বকারদের ভাষার রূপান্তর আর সৃষ্টির এই ধারণা বৈজ্ঞানিক চিন্তায় সমৃদ্ধ। তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের আওতায় স্যার জেমস জোনসের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের তত্ত্বের মধ্যে একটা বড়ো ফাঁক রয়ে গেছে। এখানে বহুভাষিত এলাকার ভাষাপ্রকাশব্যবস্থাকে হিসেবের মধ্যে ধরা হয় নি, তাই এ দিয়ে ভাষার জন্ম ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ঠিক পৌঁছানো যায় না। এই তত্ত্বের মধ্যে অনেক সঠিক ধারণা থাকলেও, এতে তত্ত্বের সীমা-বদ্ধতাও লক্ষ করার মতো।

এই কথা কয়টি বলার উদ্দেশ্য সংস্কৃতকে ভারতীয় আর্যভাষার জননী বলে অভিহিত করা, সংস্কৃত ও বেদের সমাজে স্থান চিন্তা করে নিয়ে ভাষাসমূহকে তার সঙ্গে যুক্ত করাটা অবৈজ্ঞানিক—কারণ তা ভাষার উন্নয়নে মিশ্রণ, আত্মসাৎকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে প্রায় অস্বীকারই করে।

প্রাকৃত বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক

আমাদের দেশে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বেদ-উপনিষদের স্থান নির্দেশ করছে ভাষাপ্রকাশব্যবস্থার সামাজিক কাঠামোতে সংস্কৃতের স্থান। এই স্থান অত্যন্ত দীর্ঘ-স্থায়ী ও রক্ষণশীল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের দিনে, তার রাজধর্মের সম্মান পাবার দিনেও পালি, প্রাকৃত সমাজে সংস্কৃতের স্থান তেমন করে নাড়ানো যায় নি। (ঠিক এমনটাই ঘটেছে ইসলামধর্মের রাজধর্মের দিনেও। ভাষার সরকারি কাজে ব্যবহার ইত্যাদিও বিদ্যা- ও জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে এমন গতিশীলতা আনতে পারে নি যাতে ভারতের বর্ণপ্রথায় বাঁধা সমাজে সংস্কৃতের স্থান টলানো সম্ভব হয়।) এই বাস্তব সত্যকে নির্বোধের মতো অস্বীকার করলে খানিকটা অন্ধের মতো তার বিরুদ্ধে লড়াইটা প্রধান হয়ে দাঁড়াবে। প্রাকৃত ভাষাকে সংস্কৃতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের জ্ঞানচর্চার ভাষায় পরিণত করা কঠিন হবে। এককালে একই কারণে প্রাকৃতভাষা ও তার সর্বজন-গ্রাহ্য 'লিখিতরূপ' পালি ভারতের গণ্ডীর বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের এলাকায়—সিংহল, বর্মা, কম্বোজ, এমনকী চীনাভাষা এলাকায়—উঁচুস্থান গ্রহণ করলেও ভারতবর্ষে সংস্কৃতের স্থানকে নড়াতে পারে নি। এতে প্রাকৃতভাষার (আমাদের ক্ষেত্রে বাঙলার) ক্রিয়া-শীলতা সীমাবদ্ধ থেকে যায়, ভাষার মুক্তির অভাবে জ্ঞানের মুক্তি ঘটে নি। একথাও ঠিক বেদের ভাষা সংস্কৃতের চাইতে অনেক বেশি প্রাকৃত। কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞান-চর্চা ও সঞ্চয়নে সংস্কৃতের স্থানই সমাজের উচ্চ-কোটিতে নিজের বৈশিষ্ট্য ও তার আভিজাত্য সমাজে দুই হাজারের উপর বেশ কিছু বছর পার করে বর্ণপ্রথাভিত্তিক সমাজে নিজের প্রভাব জারি রেখেছে, আজও তার খুব একটা বড়ো ব্যতিক্রম হয় নি। এটা দুঃখের (সমাজমুক্তি, জ্ঞানমুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে) হলেও বাস্তব। তাই একে বাতিল করা বা খারিজ করা কেবল নিজেদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না, ভাষাকে সমৃদ্ধ করার সামগ্রিক ব্যবস্থা না করে, তার চাইতেও বেশি এর সমৃদ্ধ সম্ভারকে জাতপাতের লড়াইয়ের কথা ভেবে বাদ দিলে নিরবুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়।

ইউরোপের সংস্কার-আন্দোলনের একটা বড়ো কাজ ছিল ভাষার মুক্তি ঘটানো। সেদিন পাদ্রী-কর্তৃত্বের যুগে জ্ঞানচর্চা আটকে গিয়েছিল লাতিন

ভাষার পরিধিতে। ফলে এর বিস্তৃতিতে লাতিনের হাত থেকে মুক্ত হওয়াটা জরুরি প্রয়োজন ছিল সেখানকার প্রাকৃতজনের ভাষার সমৃদ্ধির জন্য। মার্টিন লুথার, টোমাস মুয়েনৎচার পাঁচ শ বছর আগে সেই কাজটাই করেছিলেন। সেইখানে তাঁদের সংস্কার আন্দোলনের সাফল্য এবং যৌক্তিকতা। তবু সেখানে আজও জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে লাতিন, গ্রীক ভাষাকে অস্বীকার করা হয় নি, পরিভাষাসৃষ্টিতে, এবং বিশেষ করে পুরোনো পরিভাষার ব্যবহারিক ক্রিয়াশীলতাকে হঠাৎ বাতিল করার জন্য পাগলামি শুরু হয় নি। হয়েছিল হিটলারি জার্মানিতে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে সবকিছু পরিভাষাকে জার্মানিকরণ প্রচেষ্টায়। সেটা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি, তবে বিদেশী শব্দকে জ্ঞান-ও বিদ্যা-চর্চাকে প্রাধান্য দিলে অসুবিধা ঘটতে বাধ্য—সেটাও এখানে মনে রাখা দরকার।

বহুভাষার দেশে প্রাকৃতীকরণ-প্রক্রিয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এর একটা সামাজিক দিক আছে, সেটা ভাষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের দিক, ভাষার সামাজিক ক্রিয়াশীলতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে না, আর বর্তমানেও তাও চলেছে। অন্যদিকে জ্ঞানচর্চা ও শাস্ত্রচর্চা একদিনে গড়ে ওঠে না; এর একটা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থাকে। সংস্কৃত জ্ঞানচর্চা ও শাস্ত্রচর্চার ভাষা হয়ে ভারতীয় সভ্যতায় দুই হাজারের বেশি বছরের গণ্ডী পার করে অপরিমিত শক্তি সঞ্চয় করেছে। সমাজের জ্ঞানসঞ্চয় খুব বেশি বাঁধা পড়ে যায় সংস্কৃতে। এই-ভাবে এই ভাষার সমৃদ্ধি ঘটে, আর তা আমাদের সমাজের জ্ঞানের একটি উৎস হয়ে থাকে। এইখানেই তার সামাজিক কাজ বা দায়িত্ব।

অন্যদিকে প্রাকৃত বাঙলারও একটা সামাজিক মূল্য রয়েছে, আর তারও একটা ধারাবাহিক সমৃদ্ধি আর উন্নয়ন হয়েছে। তার কাজ কেবল মুখের ভাষায় শেষ হয়ে যায় নি। বরং শিক্ষার বিস্তৃতিতে, বাঙলার সাহিত্যসৃষ্টিতে, জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার প্রসারে বিদেশী শাসকদের প্রয়োজনে বেশ কিছুটা মুক্তি অর্জন করে। ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতিতে ফারসি, তুর্কি আর তার সঙ্গে আরবিও প্রাকৃত বাঙলায় এসে মেশে। রাজভাষার পরিবর্তন হওয়াতে সংস্কৃত ব্যবহারের বেড়া আরো ছোটো হয়ে আসে, আর প্রায় এই সময়েই প্রায় সব কয়টি আধুনিক আর্যভাষা (যাদের আমরা এখানে প্রাকৃত ভাষা বলে অভিহিত করছি।) রূপ নেয়। পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের বহুভাষিত এলাকায় ভাষার রূপান্তর আরো পরিষ্কার বোঝা যায়। এখানে এর বিস্তৃত আলোচনায় যাবার সুযোগ নেই, আর হয়তো দরকারও নেই। তবে এই রূপান্তরের কাল পূর্বভারতে প্রায় এক হাজার বছর ধরা হয়। এতে মৈথিলী, বাঙলা, ওড়িয়া বা অসমীয়ার কালনির্দেশে কিছু হেরফের হতে পারে, কিন্তু বহু-ভাষিত ভাষাপ্রকাশব্যবস্থায় এদের মিল নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই।

ভারত ভূ-খণ্ডের সামাজিক বহুভাষিকতা সর্বত্র সমানভাবে সৃষ্টি হয় নি। বহুভাষিত ক্ষেত্রের মধ্যে বৈচিত্র্যের পার্থক্য আছে। বিভিন্ন জনজাতিক ভাষা-পরিবারের যতই গঙ্গার অববাহিকা ধরে উর্বর মাটি ও নিজস্ব বাসস্থানের সন্ধানে বেড়িয়েছে, ততই তারা অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বহুভাষিত এলাকা ও সামাজিক বহুভাষিকতা সৃষ্টি করেছে। এই স্থানান্তর অনেক সময় নিজেদের বাঁচার তাগিদে সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চলে আবডাল সৃষ্টিও করেছে, কিন্তু তারই পাশাপাশি এলাকা দখল, রাজ্যগঠন ইত্যাদি কারণে বহুভাষিত প্রকাশব্যবস্থা, ও সামাজিক বহু-ভাষিকতার প্রদেশ সৃষ্টি করেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে মাগধী প্রাকৃত এলাকায় ভাষাপরিবারের সংমিশ্রণটা অনেক বেশি ব্যাপক। এই পার্থক্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৈয়াকরণদের চোখে যেমন ধরা পড়েছে তেমনি আমাদের দেশের আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের স্রষ্টা ও পণ্ডিতদেরও দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিতপ্রবর

ভাষাবিজ্ঞানী মহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙলা ভাষার গড়ে-ওঠা উপাদানের সামগ্রিকভাবে ধ্বনি, অভিধান, ও ব্যাকরণের গড়নগত পার্থক্যগুলি খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এই কারণেই সুনীতিকুমারের অসমীয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে কোনো কষ্ট হয় নি। সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে বাধা পেলেও মৈথিলী, ভোজপুরী সাহিত্যের ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে সাহিত্য অকাদেমিতে তাঁরই উদ্যোগে। এই বহুভাষিত দেশে ভাষার সংস্পর্শ ও সংমিশ্রণ বুঝতে "কিরাতজনকৃতি" তাঁর একটি মূল্যবান রচনা। এখানে তাঁর ধ্যানধারণা নতুন জ্ঞানে বহুভাষিত দেশে ভাষার রূপান্তরপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন।

দ্বিতীয় ধরনের ভাষারূপান্তর হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আধুনিক আর্য-ভাষাগুলির মধ্যে। এখানে বহুভাষিত চরিত্র ও সামাজিক বহুভাষিকতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কেবল বাইরে থেকে আগত ক্ষুদ্র জনজাতিক গোষ্ঠী তাদের রাজত্ব স্থাপন করতে গিয়ে ওই এলাকার প্রধান ও প্রভাবশালী ভাষার মধ্যে মিশে যায়। তার ফলে যে ভাষামিশ্রণ হয়েছে তার চরিত্রও সীমিত চরিত্রের। এখানে ভাষাপরিবর্তন খানিকটা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয়। আমরা যেহেতু বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক বা বন্ধন নিয়ে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, তাই এখানে এই সম্পর্কে যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করার অভিপ্রায় আমাদের নেই। তবে এই এলাকার ভাষা-ব্যবহারে চরিত্র সম্পর্কে একটা চিন্তিত সিদ্ধান্ত রাখতে চাই—এই এলাকার এই রক্ষণশীল চরিত্রই এখানকার ভাষা-ব্যবহারে একটা আগ্রাসী মনোভাবের সৃষ্টি করেছে, ভাষার মিশ্রণ ও রূপান্তরকে বোঝার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সৃষ্টি করতে বাধার সৃষ্টি করছে। আর তাই হচ্ছে এই বিরাট দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা উদার সামগ্রিক সম্পর্ক সৃষ্টির সবচেয়ে বড়ো পরিপন্থী।

আধুনিক বাঙলায় সংস্কৃতের স্থান

আমাদের আলোচনা এ পর্যন্ত বাঙলা ভাষা কতটা প্রাকৃত (naturalized) ভাষা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। তার কারণ হল, এই ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের বন্ধনটা কোন্ পর্যায়ের তা তুলে ধরার জন্য। তা ছাড়া, ভাষার বংশ বা পরিবার-ধারণার আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের বিচারলব্ধ ফল অনুযায়ী পরিবর্তন হওয়া উচিত, সে কথা বোঝার জন্য। এই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় বহুভাষিত ভাষাপ্রকাশক্ষেত্রে ভাষার মিশ্রণ আর উদ্ভবের আলোচনা করার জন্য।

বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞানে পিজিন বা ক্রেওল নিয়ে একটা বড়ো রকমের আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনা ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে অন্যভাষার সংস্পর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও বহুভাষার দেশে, বিশেষ করে ভাষার সংস্পর্শ (contact) কী করে ভাষার পরিবর্তনে সাহায্য করে, সেই বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাকৃত ভাষাতাত্ত্বিকদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ সেই কথা উল্লেখ করেছি। [Sunil Sen Gupta Pidginisation and Language Formation (A Study in the Organic Process of Linguistic Development) XIV Internationals Linguisten Kongress, Berlin 1987] পিজিন-আলোচনা থেকে অনেক বক্তব্য বের হয়ে এলেও এর ইউরোপীয় কেন্দ্রিকতা লক্ষণীয়। এখানে বহুভাষিত দেশে ভাষা-প্রকাশ-ব্যবস্থায় পারস্পরিক সংস্পর্শে আসার ফল আর বিভিন্ন ভাষা গড়ে ওঠার কথা নিয়ে আলোচনা হয় নি। ভারতবর্ষে প্রাকৃতীকরণ ব্যাপারটা এই আলোচনায় আদৌ আসে নি। আমরা তা সত্ত্বেও এইসব আলোচনার মধ্যে ভাষার সংস্পর্শে বহুভাষিত ক্ষেত্রে ভাষার সৃষ্টি সম্পর্কেও ধারণার আভাস পাই। লাবোভ মনে করেন :

'We can no longer assert that any area of linguistic structure is immune to hybridization and out of influence' —in Del Hyme. Pidginisation and Creolisation—1971, P 447, Cambridge]

ওই একই সংকলনে W. J. (117 ff) তাঁর Salient and Substantive Pidginisation —লেখায় বলতে চাইছেন—'But the time ought to come when other language will be examined in the light of these cases, for if pidgins survive they become *naturalised* (জোর মদীয়, সু-সেন) although not necessarily to the same degree.... ।'

বাঙলা ভাষারও সৃষ্টি এই প্রাকৃতীকরণের মধ্য দিয়ে। এতে মূলত এখানকার বহুভাষিত ভাষাপ্রকাশ-ক্ষেত্রে সম্পর্ক কাজ করেছে। এই প্রক্রিয়া এই বিস্তৃত অঞ্চলে আজও চলেছে এবং তার ফলে ছোটো এবং ধীরে-ধীরে-বড়ো হয়ে-ওঠা ভাষাগোষ্ঠী ও ভাষারীতি (কোনো ভাষাপ্রকার language variants নয়) দেখা যাচ্ছে।

বহুভাষিত ভাষাপ্রকাশক্ষেত্রে সমস্ত ভাষার উন্নতির মান এক পর্যায়ে থাকে না, বিশেষত যেখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ভিন্ন-ভিন্ন জনজাতিক ভাষাভিত্তিক পরিবার থেকে এসেছে। এই অসম বিকাশই সামাজিক ভাষাপ্রকাশ-ইচ্ছার তাড়না বাধ্য করে এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার মিশ্রণ। যাতে সমগ্র ভাষাগোষ্ঠী-সমূহ ধীরে-ধীরে এক বা একাধিক ভাষাপ্রকাশ-গোষ্ঠীতে পরিণত হয় (Communicative Community)। ভারতবর্ষে ভাষার উন্নয়নের মানের অসমতার একটা বড়ো কারণ সামাজিক। এখানে এক ভাষার মানুষ অন্য ভাষার পাশাপাশি থেকেও অন্য সমাজব্যবস্থার উন্নয়নের স্তরে থাকতে পারে—যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, বোড়ো, গারো বা রঙ (লেপচা) ভাষাগোষ্ঠী সামাজিক উন্নতিতে সমাজ-ব্যবস্থার অন্য স্তরে থাকতে পারে বা রয়েছে। এখানে এই পার্থক্যের মধ্যে অবশ্য একটা সামগ্রিক ব্যবস্থাও সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতীকরণ বা পিজিন ভাষা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভাষা কাদের জন্য এবং কাদের সংস্পর্শে সৃষ্টি, তা ভাষাপরিবর্তনের চরিত্র নির্ধারণ করে। বহুভাষিত ভাষাপ্রকাশ ব্যবস্থায় কারা কী কাজে ভাষা ব্যবহার করছে তার উপর ভাষাটা কিভাবে গড়ে উঠবে ঠিক হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক ও ভাষার স্তরে বিভক্ত সমাজে ভাষাব্যবহারকারীদের প্রয়োজন - সম্পর্ক নির্ধারিত করবে পরিবর্তনের ঢঙ। আমার মতে : (উপরে উক্ত রচনা দ্রষ্টব্য)

১। ভাষাব্যবহারকারীরা যদি বেশি সংখ্যায় অনুন্নত জনজাতিক গোষ্ঠী থেকে আসে তবে সেখানে আভিধানিক গ্রহণটা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে উন্নততর সামাজিক জনজাতিক থেকে আসবে, কারণ সামাজিক প্রয়োজনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ওই ভাষাতে ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আর তার প্রয়োজনে শব্দগ্রহণপ্রথা চালু হয় ;

২। দৈনন্দিন ব্যবহারের শব্দ বা পদ দুই বা ভিন্ন ভাষার পদের পাশাপাশি থেকে যাবে। এখানে মিশ্রণে অনেক সমার্থবোধক পদ জড়ো হবে ;

৩। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীর (উন্নত নয়) ব্যাকরণ-কাঠামো এখানে বেশি করে মিশবে, কারণ প্রাকৃতভাষার ব্যবহারকারী তারা। এর ফলে বাঙলা ব্যাকরণের কাঠামোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জন-জাতিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব পড়বে ;

৪। এই সংস্পর্শ প্রাকৃতীকরণ বা পিজিন গঠনে বাক্যগঠনরীতিতে পরিবর্তন আনে ;

৫। ধ্বনিগত দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর ধ্বনি-ব্যবহাররীতি প্রাকৃতীকরণ প্রথাকে প্রভাবিত করবে, ঝোঁক হবে সেইদিকে সামঞ্জস্য আনা।

এই হল মোটামুটি পাঁচটি প্রক্রিয়া যা প্রাকৃতীকরণের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। পিজিনের জন্মেও এই প্রক্রিয়াই চলে।

এইভাবে যে ভাষা গড়ে উঠছে তাকে কোনো ভাষাপরিবারের বংশোদ্ভূত করলে আপত্তি নেই (খানিকটা অসবর্ণ ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন জাতের মধ্যে মিলন), তবে সেটা কেবল নিজেদের কিংবা বিশেষ সমাজগোষ্ঠীর রোমান্তিকতায় আত্মতৃপ্তি আনে, বৈজ্ঞানিকতা তেমনভাবে বাড়ায় না।

সংস্কৃত উৎস — বাঙলা পরিভাষা

বাঙলা ভাষার বিদ্যাচর্চা আর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটা কথা খুব বেশি আর বারবার বলা হয়—(ইংরেজির কথা ছেড়ে দিয়ে) সংস্কৃতকে বাঙলা ভাষার পরিভাষার উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। এতে আমাদের উপরোক্ত পাঁচটি সূত্রের সঙ্গে তেমন কোনো বিরোধ নেই, তবে একভাষা-উৎসের গোঁড়ামিতে এখানে আশ্রয়গ্রহণ করাটা ঠিক হবে না।

জ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃত বহু প্রাচীন কাল থেকে, আর তা সীমাবদ্ধ ছিল বিদগ্ধী সমাজের মধ্যে, যাঁদের বেদের অধ্যয়নে অধিকার ছিল। স্বভাবতই এই ভাষার উন্নতির প্রয়োজনের খাতিরে বর্তমানে বাঙলার কাছেও অতি প্রয়োজনীয় উৎস। আধুনিক বাঙলা গদ্যরীতি তৈরির ক্ষেত্রে এই বিদগ্ধী ভাষা-প্রকাশ (ভাষা) গোষ্ঠীর (language communicative community) বাঙলাকে সংস্কৃত প্রভাবে এনে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙলার এই পরিবর্তন পছন্দ করেন নি, না করারই কথা—কারণ এর ফলে ভাষার মুক্তিতে বাধা সৃষ্টি হয়।

'বিদেশী রাজার হুকুমে পণ্ডিতেরা মিলে পুঁথিতে আধুনিক গদ্য বাঙলা পাকা করে গড়েছে। অথচ গদ্যভাষা যে সর্বসাধারণের ভাষা তার মধ্যে অপণ্ডিতের ভাগই বেশি।···বিশুদ্ধভাবে বাঁধাবাঁধি—সেই বাঁধন তার নিজের নিয়মসংগত নয় ·····সমস্তই সংস্কৃতের ফরমায়েস। হঠাৎ বাবুর মতো প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেকে বনেদী বংশের (আমার মতে ব্রাহ্মণত্ব জাহিরের—সুসেন)। বলে প্রমাণ করতে।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, 'বাঙলাভাষাকে বাঙলা-ভাষা বলে স্বীকার করাই স্বভাবসঙ্গত। নিয়মগুলি উদ্ভাবনের কাজ সুনীতিকুমারের দলের।' এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ভাষাবিজ্ঞানীদের উপর বিরাট দায়িত্ব দিয়েছেন। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ ২৬১)।

বর্তমানে পশ্চিম বাঙলায় সংস্কৃতের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ বিচ্ছিন্ন করা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে, তাতে যে দিক থেকে এই সিদ্ধান্তকে অবৈজ্ঞানিক বলা হচ্ছে তা সম্ভবত সবটা ঠিক নয়। একথা ঠিকই—'বাঙলাকে বাঙলা বলে স্বীকার করেও একথা মানতে হবে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে, বাংলা ভাষায় তাকে যদি গ্রহণ না করি। তবে আমাদের সাহিত্য ক্ষীণপ্রাণ ও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে।' (বাংলা শব্দতত্ত্ব, ২৪২) এই কথা কয়টির মধ্যে রবীন্দ্র ভাষাচিন্তায় পরিমিতির রূপই ফুটে উঠেছে।

যে দেশে প্রাচীন ভাষা রয়েছে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে নতুন ভাষার সঙ্গে বাঁধলে ভাষার মুক্তি আর জ্ঞানের মুক্তিতে ভাষাটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি নতুন জ্ঞানের শব্দচয়ন, পরিভাষার ক্ষেত্রে এই উৎসকে সরিয়ে দিলে—'বাংলাকে সংস্কৃতভাষার দানসত্র ও অন্নসত্র থেকে দূরে নিয়ে এলে গুরুতর ক্ষতি ঘটবে' ও ঘটে।

ক্ষতিটা ধরার সবচেয়ে বড়ো জায়গা পরিভাষার ব্যবহার। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাক—গোঁড়ামির যেমন আমাদের দরকার নেই, তেমনি আবার বিজ্ঞানের পরিভাষা ইংরাজি (আসলে লাতিন) থেকে নিলে আমরা যে অর্থ খুব বুঝতে পারি, তা নয়। ধরা যাক, "কেরোসিন" বাঙলায় সকলেই গ্রহণ করেছেন—হিন্দিতে একে আজও "মিট্টিকা তেল" বলা হয়। এতে লাতিন-না-জানা সাধারণ মানুষের কাছে অর্থটা পরিষ্কার হয়। জার্মান ভাষাতেও "Erdoel" কথাটি ব্যবহার হয়। কেরোসিন কথাটি ইংরেজদের কাছে অর্থ না বুঝে বস্তুকে চিহ্নিত করা, আজ তা লোকের ব্যবহারে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে, তা সত্ত্বেও যদি এই শব্দটি বাঙলা বা তার অন্নসত্র থেকে নেওয়া যেত তবে তা লোকের জ্ঞানে নতুন তথ্য সংযোজন করত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

আমাদের পরিভাষাসৃষ্টিতে ভাষাবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব বিরাট, তেমনি একে যতদিন না একটা স্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে আনা না যাচ্ছে ততদিন সংস্কৃত ভাষার সাধারণ জ্ঞান খুব অকেজো নয়। তা সাধারণ মানুষকে শব্দসৃষ্টি ও সৃষ্ট শব্দের অর্থগ্রহণে সাহায্য করবে। ইস্কুলের পাঠ্যতালিকায় তার স্থান কোথায় হবে তার আলোচনা অবান্তর। বাস্তব এটা এর জ্ঞান বিশেষ-ভাবে শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া। এর জ্ঞান উচ্চশিক্ষার প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বজনীন জ্ঞানের বাঙলা উৎসকে সমৃদ্ধ করবে। যেমন করবে বাঙলা ভাষার জ্ঞানের উৎসকে বাড়ানোর জন্য প্রচলিত শব্দের এমনকী ফারসি, তুর্কি, আরবি, ইংরেজি থেকে আগত শব্দের মধ্যে পরিভাষার জন্য হাতড়ানো।

ব্যাকগ্রাউনড কথাটা আঁকিয়ের কাছে অন্য মানে, এর পরিভাষার জন্য পটভূমির চাইতে জমিন বা জমি কথাটা অনেক বেশি অর্থদ্যোতক। পটুয়ারা তাদের চালচিত্র তৈরিতে এই কথাটাই ব্যবহার করেন (একথা অধ্যাপক সৌমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় বলেছেন)। তাই রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে গ্রহণ ও বর্জনটাকে তারই মতো পরিমিত রূপে গ্রহণ করতে হবে। বাঙলার ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে অবশ্য সংস্কৃত জ্ঞানটার অপরিহার্যতাও এইখানে।

'চতুরঙ্গে'র জুলাই সংখ্যায় 'ভাষাবিজ্ঞানীর এ কোন্ শোচনীয় পরিণতি' নামক মৃণাল নাথের সমালোচনা-প্রবন্ধে কয়েকটি গুরুতর মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। এ জন্যে আমরা পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। তাঁরা অনুগ্রহ করে ভুলগুলি সংশোধন করে নিলে আমরা বাধিত হব।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল ছাপা হয়েছে	সঠিক হবে
২৮৪	১৪	রাঙ্কোভস্কিয়	য়াঙ্কোভস্কির
২৮৪	২৭	মার্থাজি ভাইনইয়ার্ড	মার্থাজ ভাইনইয়ার্ড
২৮৫	২৪	আরলোট্যো	আরলোট্টো
২৮৬	৩	Kurylowick	Kurylowicz
২৮৬	১৯	মানচেজাক (Manezak)	মানচজাক (Manczak)
২৮৬	৩১	মানচেজাকের	মানচজাকের
২৮৬	২৫ (২য় স্তম্ভ)	ভাস্কর্য (তুলনীয় ভাস্কর : ভাস্কর্য)	তাস্কর্য (তুলনীয় ভাস্কর : ভাস্কর্য)
২৮৭	৭	সংস্করণ	সংকলন

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমাজভাবনা

রণেন্দ্রনাথ দেব

উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙলার নবজাগরণ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সেই কালপর্বের শ্রেষ্ঠ নায়কদের সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ পেয়েছি। সে তুলনায় রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে অল্প, যদিও মনীষার দীপ্তিতে তিনিও ছিলেন সমুজ্জ্বল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলী প্রকাশ করলেও সাধারণভাবে পাঠকদের হাতে তাঁর রচনা পৌঁছেছে সামান্য। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরকে বাদ দিয়ে সেই যুগটির পূর্ণ পরিচয়লাভ সম্ভব নয়।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্টে তাঁর জন্ম। তাঁদের পরিবার কনৌজব্রাহ্মণগোষ্ঠীভুক্ত। তাঁদের এক পূর্ব-পুরুষ গদাধর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদের ফতেসিং পরগনায় টেঁয়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। বংশানুক্রমে তাঁরা বিদ্যাচর্চায় রত। তাঁর পিতা গোবিন্দসুন্দর শুধু সাহিত্য নয়—গণিত, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রাণ, ধর্ম বিষয়ে উদারমনোভাবসম্পন্ন। পিতার কাছ থেকে এ-সমস্ত গুণ লাভ করেন রামেন্দ্রসুন্দর।

রামেন্দ্রসুন্দর ছয় বছর বয়সে জেমো গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শুরু করেন। মেধাবী ছাত্ররূপে প্রথম থেকেই ছিলেন খ্যাতিমান। ১৮৭৫ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। এর পরের বছর ভরতি হন কান্দী ইংরাজি স্কুলে। এই স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়বার সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পঁচিশ টাকার বৃত্তি পান। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হবার পর তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়। ১৮৮৬ সালে বিজ্ঞান অনার্সে এবং ১৮৮৭ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর অধ্যাপক পেডলারের উৎসাহে তিনি গবেষণায় ব্রতী হয়ে পরের বছরই প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি চেয়েছিলেন কলকাতায় থেকে সাহিত্যচর্চা তথা বিজ্ঞান-অনুশীলন চালিয়ে যাবেন। সেজন্য বদলি হবার ভয়ে সরকারি চাকরিও অঙ্গীকার করেন নি। ১৮৯২ সালে তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে সেই কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাজ করতে-করতে ১৯১৯ সালের ৬ জুন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে গড়ে তুলতে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

তাঁর জীবনের আর-এক কীর্তি বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্বদান। সে-সময়ে তাঁর লেখা "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" দেশে অভূতপূর্ব প্রেরণা যোগায়।

মাত্র পঞ্চান্ন বছর বেঁচেছিলেন। এর মধ্যে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন পত্রিকায়—যথা "নবজীবন", "ভারতী", "সাধনা", "প্রবাসী", "সাহিত্য", "বঙ্গদর্শন", "মানসী", "সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা"। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়—"প্রকৃতি", "বিচিত্র জগৎ", "মায়াপুরী", "জিজ্ঞাসা", "কর্মকথা", "বিচিত্র প্রসঙ্গ", "যজ্ঞকথা", "জগৎকথা", "শব্দকথা", "নানাকথা", "চরিতকথা" ইত্যাদি।

Ramendra Sundar Trivedi—His Social and Political Ideas—A Study by Dr. Dipika Majumder. Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd. 7-B Lake Place, Calcutta-29. October 1988. Pp 165. Rs. 120.

ইংরাজি ভাষায় সুদক্ষ হলেও তিনি লিখেছেন প্রধানত মাতৃভাষা বাঙলায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হলে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—বাঙলা ছাড়া অন্য ভাষায় বলবেন না।

জ্ঞানের চর্চায় এবং মাতৃভাষার সেবায় যিনি জীবন ব্যয় করলেন, সেই রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে কলকাতায় একটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান গড়া হয় নি, এমনি আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ!

২

অধ্যাপক দীপিকা মজুমদার রামেন্দ্রসুন্দর বিষয়ে একটি গবেষণা-নিবন্ধ রচনা করে আমাদের জাতীয় ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচনাটি ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত হয়েছে। গবেষণা-প্রবন্ধ হলেও এটি সর্বসাধারণের পঠনীয় গ্রন্থ।

বইটিতে সর্বমোট ছয়টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়—অবতরণিকা। দ্বিতীয় অধ্যায়—রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তায় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবনার সমন্বয়। তৃতীয় অধ্যায়—রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা। চতুর্থ অধ্যায়ে পাই তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয়। পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয় বিশ্লেষণাত্মক তুলন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে তাঁর যুগের সংযোগের কথা। প্রতিটি অধ্যায় বেশ বিস্তৃত আর বিশ্লেষণধর্মী। এ ছাড়া লেখিকা প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জীও যোজনা করেছেন।

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে দু-একটি দিকের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

রামেন্দ্রসুন্দর মূলত ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলি প্রায় সবই বিজ্ঞানবিষয়ক। তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ডারউইন, হাক্স্‌লি, কেলভিন, ক্লিফোর্ড, হেল্‌মহোল্‌স্, ম্যাক্স্‌ওয়েল ও হার্জের দ্বারা। কিন্তু ক্রমশ তাঁর ধারণা হয়—বিজ্ঞানের দ্বারা চরম সত্যকে জানা যায় না, কারণ (১) বিজ্ঞানের জ্ঞান সার্বভৌম সত্য নয়। একটি খণ্ডিত জ্ঞানমাত্র; (২) বিজ্ঞান প্রাকৃতিক সংঘটনের হেতুমূল আবিষ্কার করতে অপারগ; (৩) বিজ্ঞানের জগৎ একটা কল্পজগৎ শুধু। বিজ্ঞান-অনুসন্ধানে অতৃপ্তি তাঁর মনকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের দিকে ঠেলে দেয়। অবশ্য তিনি শঙ্করদর্শনের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদকেও স্বীকার করতে পারেন নি। জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলনের সম্ভাবনাকেও তিনি অসম্ভব বিবেচনা করেন।

সমাজের গঠন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন তিনি। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের বিবর্তন তিনি কৌতূহল নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণের পেছনে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনাও সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব এই যে, তিনি ভারতীয় আদর্শ আর পাশ্চাত্ত্য আদর্শ—দুয়ের এক সমন্বয় কামনা করেছিলেন। ভারতীয়দের সন্ন্যাসপ্রীতি আর ত্যাগব্রতকে তিনি সর্বথা কাম্য মনে করেন নি। বৈদিক যুগে মানুষ ছিল কর্মঠ, গতিশীল, সংসার-প্রিয়। ঔপনিষদিক যুগে মানুষের কর্মোদ্যম ক্ষীণ হয়ে আসে। তখনই সন্ন্যাসবাদ আর নিয়তিনির্ভরতা ভারতীয়দের চিত্তকে অধিকার করে। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসবাদের বিরোধী। পক্ষান্তরে, ইয়োরোপের উদ্যমশীলতা আর গতিচঞ্চলতার প্রশংসা করলেও পাশ্চাত্ত্যের জীবন-আদর্শকে তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি।

তাঁর সামাজিক বিশ্লেষণের একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি বর্ণাশ্রমধর্মকে হেয় জ্ঞান করেন নি, এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন না। অবশ্য এ কথাও তিনি বলেছেন, কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সহায়তা ব্যতীত শূদ্র ধর্মানুষ্ঠান করতে পারবে না।

পশ্চিমী ধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে তাঁর চিত্ত প্রতিকূল ছিল, যদিও তিনি সে শিক্ষাপদ্ধতির একটি শ্রেষ্ঠ ফল। স্যাডলার কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান-

কালে তিনি বলেছিলেন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশের ভূমিতে এক বিজাতীয় বৃক্ষ। ভারতীয় জীবনযাত্রার গভীর উৎসের সঙ্গে এ শিক্ষাপদ্ধতি যোগরহিত। তিনি সশ্রদ্ধভাবে টোল-চতুষ্পাঠীর উল্লেখ করে বলেন—ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, গদাধর, রঘুনাথ, লীলাবতী অর্থের জন্যে নয়, শুধুমাত্র জ্ঞান-লাভের প্রবর্তনায় বিদ্যাচর্চায় ব্রতী হন।

একটি জাতির সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় সমাজের বিকাশ সেরকম স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাধিত হয় নি। বিদেশী শাসন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার সহস্র বাহু বিস্তার করে শাসনের নামে প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীকে দুর্বল আর দীন করে দিয়েছে, এই আক্ষেপ রামেন্দ্রসুন্দর বারবার করেছেন। ভারতের ইতিহাস আর পাশ্চাত্ত্যের ইতিহাস এক-ছাঁচে লেখা হতে পারে না। ভারতের ইতিহাস সমাজ-জীবনের ইতিহাস। পাশ্চাত্ত্যের ইতিহাস রাষ্ট্রের ইতিহাস। সেইজন্যে ভারতের ইতিহাস রচনা করার জন্যে চাই তার রীতিনীতি, গ্রাম্যগাথা, লোকগীতি ও লোককথার বিরাট সংকলন। রাজশাহীতে বঙ্গ-সাহিত্যসম্মেলনে তিনি দেশবাসীকে এসকল উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর জাতীয়তাবাদী আবেগের দ্বারা গভীরভাবে অনুরঞ্জিত। ভারতবাসী ইংরাজের প্রভুত্বস্বীকারে বাধ্য হয়েছিল, কারণ তার মধ্যে ছিল ইহবিমুখতা এবং অকারণ সন্ন্যাসপ্রীতি।

তাঁর মতে, পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্রীয় আদর্শের তুলনায় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল অনেক উন্নত স্তরের। পাশ্চাত্ত্যে চলেছে রাজশক্তি আর প্রজাশক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ। অন্যদিকে ভারতবাসীর জীবনে রাজশক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল যৎসামান্য। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয়—রাজশক্তি আর প্রজাশক্তির দ্বন্দ্ব পাশ্চাত্ত্যে বলশালী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। জাতীয়তার ভিত্তি হয়েছে দৃঢ়। সে তুলনায় ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদ নিতান্ত দীন।

রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর সত্তর বছর অতিক্রান্ত হল। তাঁর চিন্তাধারার অনেক কিছুই ছিল সমসাময়িক সংঘটনের দ্বারা প্রভাবিত। সেইসব সাময়িক ভাবনা গুরুত্ব হারিয়েছে। কিন্তু অনেক কিছু রয়েছে যা একালেও আমাদের চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে। বিজ্ঞান, দর্শন আর সাহিত্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মানসলোকে। তাঁর প্রতিভার বহুমুখীনতা ছিল বিস্ময়কর। সেইজন্যে তাঁর চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে আমরা চমকিত হই। বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা যেমন মৌলিক, তেমনি যুক্তিপূর্ণ। একালে অমন সৌষ্ঠবপূর্ণ রচনা চোখে পড়ে কই? মহাকাব্যের মতো সুন্দর প্রবন্ধ এখনো বিরল। তাঁর সমস্ত রচনার একটি সুলভ সংকলন আর কেউ না হোক, সরকার কি বার করতে পারেন না?

আলোচ্য গ্রন্থটি গবেষণা-নিবন্ধ। তাই সর্বত্র সুখপাঠ্য বলা চলে না। লেখিকা যদি গ্রন্থটির সারমর্ম সংক্ষেপে সুবিন্যস্ত করে বাঙলা ভাষায় লেখেন, অনেক পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

যোগ্য লেখকের নয়—অভাব আগ্রহী প্রকাশকের

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

কলেজ স্ট্রীট পাড়ার বইয়ের দোকানের খবর—বাঙলা ছোটোগল্পের বই বিক্রি নাকি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। সে জায়গায় বোধহয় আবার উপন্যাস

মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন—সাধন চট্টোপাধ্যায়। প্রমা, ১৯৮৭, চোদ্দ টাকা।
নেপথ্য চরিত্র—সৌমেন সেন। প্রমা, ১৯৮৬, বারো টাকা।
ঋত্বিক ঘটকের গল্প। ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ১৯৮৭, তিরিশ টাকা।

ফিরে আসছে। বাজার সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, সম্প্রতিকালে বাঙলায় উপন্যাস লেখা হচ্ছে বেশি, ছাপাও হচ্ছে, বিক্রিও তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। পাঠকের অবসর সংকুচিত হচ্ছে, ব্যক্তিজীবনে ছোটো-খাটো ঘটনা বা মনস্তাত্ত্বিক সংকটের মুহূর্তের বৈচিত্র্য বা গভীরতা বাড়ছে বলেই তো ছোটোগল্প ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আধুনিক পাঠকের কাছে। উপন্যাসে আগ্রহ বাড়ছে শুনলে মনে হয়—সামগ্রিক জীবনের রহস্য বুঝবার আগ্রহ বাড়ছে, একটা সম্পূর্ণ জীবন বা বৃহৎ সমাজ বা একটা কালকে জানবার জন্য মানুষ আবার উপন্যাসের খোঁজ করছে। হতে পারে। আবার অন্য ব্যাখ্যাও মাথায় আসে। যোগ্য ছোটো-গল্পলেখকের অভাব ঘটে নি তো সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে? তাও হতে পারে। তাহলে মনে হয়—আগ্রহী পাঠক আছে, যোগ্য লেখক নেই। এবং ব্যাপারটা একান্তই সাময়িক। ছোটোগল্পে আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে যাবে পাঠকের—এ কালে তা বোধহয় সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় যে-প্রকাশক যোগ্য লেখককে উৎসাহিত করবার ব্রত নিয়েছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রশংসার পাত্র।

এমনই এক প্রকাশকের নাম "প্রমা"। বছর কয়েক ধরে তাঁরা এক-একজন লেখকের ছোটোগল্প-সংকলন প্রকাশ করছেন সাহস করে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থানুকূল্য করছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের, এর আগে, খান-পাঁচেক উপন্যাস এবং খান-তিনেক গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। যে-গল্পসংকলনের প্রসঙ্গ এখানে উঠেছে তারও গোটা-দুই গল্প "প্রমা" পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা সাম্প্রতিক কালের গল্প-উপন্যাসের খবর রাখেন, পত্র-পত্রিকা ওলটান, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের কাছে পরিচিত। তাঁর সম্প্রতিতম গল্পসংকলন "মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন"-এ যে-দশটি গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে, আর বই বেরিয়েছে ১৯৮৭ সালে। অর্থাৎ বছর চারেক অপেক্ষা করতে হয়েছে লেখককে গল্পকয়টি গ্রন্থে গ্রথিত করতে। প্রমা প্রকাশনীর অপর একটি গল্প-সংকলন সৌমেন সেনের "নেপথ্য চরিত্র"-র খবর আরও করুণ। পঁচিশ বছর ধরে লেখা গল্পের একটা নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ সম্ভব হয়েছে ১৯৮৬ সালে, যার প্রথম গল্প সাময়িকপত্রে ছাপা হয় ১৯৫৭ সালে। হতে পারে সৌমেনবাবুকে উৎসাহিত করার মতো প্রকাশকের খোঁজ পেতে সময় লেগেছে। কিন্তু গল্প-লেখা থেকে বই-ছাপার মধ্যে এই কালব্যবধান লেখকের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক নয় কিছুতেই। এই সূত্রে আরেকটি গল্পসংকলনের প্রসঙ্গও আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। যদিও তার পটভূমিকা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। ঋত্বিক ঘটক নামটি বাঙালি সংস্কৃতি-মনাদের কাছে পরিচিত ভিন্ন সূত্রে। কিন্তু তিনিও যে একদা গল্প লিখতেন, সেকথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে বোধহয় অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি না ঋত্বিক মেমো-রিয়াল ট্রাস্ট সাহস করে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে লেখা তাঁর ১৫টি গল্প ১৯৮৭ সালে গ্রন্থাকারে ছাপতেন। এই তিন ধরনের তিন লেখকের গল্পসংকলন প্রকাশের ইতিহাস থেকেই হয়তো বা ধরা পড়ে ছোটোগল্প সম্বন্ধে আজকের প্রকাশকমহলের উৎসাহ-অনীহার প্রসঙ্গ। তবে ব্যাতানামা লেখকদের নির্বাচিত বা ওই-জাতের সংকলন প্রকাশের ব্যাপারটা অন্য। তাঁদের বাজার আছে ও থাকবে। এবং তাঁদের বিক্রি দিয়ে নির্ধারিত হবে না বাঙলায় ছোটোগল্প লেখা হবে কি হবে না। ছোটোগল্পের উপাদান থাকবে মধ্যবিত্ত - নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে অথচ ছোটোগল্পের পাঠক থাকবে না—এই প্রহেলিকার একটা সমাধান দরকার।

ছোটোগল্পের অন্তিম লগ্নে একটা অপ্রত্যাশিত চমক থাকলে অলস পাঠক বেশ তৃপ্তি পেয়ে থাকে। এ জাতের পাঠক যেন ওই চমকের প্রত্যাশাতেই এগোয়। চমক-বিন্দুতে পৌঁছলেই গল্প সার্থক হল

বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু সৎ ছোটোগল্প যত-না চমক লাগায় তার চেয়ে অনেক বেশি জানায় এবং শেখায়। জানায় মানবজীবনের না-জানা অনেক রহস্যকে, শেখায় সমাজের অনেক জটিলতার প্রকৃত কারণ। এই বিচারে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্প আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। সূচনায় একথাও মনে রাখা ভালো যে সাম্প্রতিক কোনো সেরা ছোটোগল্পের আলোচনার তাগিদে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এ গল্পগুলি বেছে নেওয়া হয় নি। তবে সৎ গল্প যে ভালো গল্প হয়ে উঠতে পারে—এ গল্প কয়টি তার প্রমাণ নিঃসন্দেহে।

নটি কাজ-খোঁজা মানুষ বিদেশ-বিভূঁইয়ে ধান-ডাঙায় রাত কাটাতে গিয়ে কী বিপত্তিতে পড়ে তার বিশদ বর্ণনার শেষে গল্পের মোড় ফেরে ভুলে দত্তের আবির্ভাবে। নটি ক্ষুধার্ত অবলা মানুষের দুর্গতি ম্লান হয়ে যায় ভুলে দত্তের চালের কাছে—পেট পুরে গরম ভাত আর ডাল খাইয়ে যে কিনে নেয় নটি জোয়ানের শ্রম। গল্পের শেষ কোনো কৃত্রিম বিদ্রোহের ইঙ্গিতে নয়, বালির গাড়ি টেনে নিয়ে চলে জোয়ানগুলি : 'বুকের চাপে মাটিতে পা গেঁথে গেঁথে চলল, যেমন করেই হোক জীবনের অন্তিম ঘাম ও রক্তবিন্দুর সাহায্যেও' ওরা ঐ করাল ডাঙা ছাড়িয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এভাবেই চলছে আবহমান কাল। সংক্ষেপে কাহিনীটুকু বলতে গেলে এই-ই ; কিন্তু গল্পের চরিত্র, সংলাপ, বর্ণনা জীবন সমাজ এবং প্রকৃতির প্রতিটি খাঁজ এমন করে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায় যে সবটুকু গল্প না পড়লে জানাটা সম্পূর্ণ হয় না কিছুতেই। অসহায় জনমজুরকে ভাতের বিনিময়ে কিনে নেওয়ার চমকই গল্পের সবটুকু নয়। এই পরিণতিতে পৌঁছবার পথটুকুতেও মানুষ আর সমাজের অনেকখানি জানা হয়ে যায় পাঠকের, যাতে গল্পের শেষ ছত্র 'ওরা চলতে থাকে'-তে বিষাদ বা নৈরাশ্য নয়—জীবনকে স্পষ্টভাবে জানার প্রত্যয়ে পাঠকের চেতনা উদ্দীপ্ত হয় সুনিশ্চিতভাবে।

এ সমাজে ভুলে দত্ত নয়, কেদারেশ্বর ঘোষ-দস্তিদারও আছেন। তবে তাঁরা অশোক রুদ্রকে খোলা চিঠি লিখে নিজের সচেতন পাপের স্বীকারোক্তি করেন না। করেন না বলেই সাধন চট্টোপাধ্যায়কে কলম ধরতে হয় কেদারবাবুর ব-কলমে। নইলে অশোক রুদ্রের গবেষণা-সিদ্ধান্তই তো জ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী হয়ে যায়। নাগরিক মধ্যবিত্ত পরম নিশ্চিন্তে জেনে তৃপ্তি পায় যে ভূমিদাস বা মুনিশ-মাহিন্দার আর নেই আজকের সমাজে। খোলা চিঠির ঢঙে লেখা গল্প পণ্ডিতী গবেষণার মুখোশ খুলে দিতে পারে যদি সাধনবাবুর মতো গল্প-লেখকেরা একটু এগিয়ে আসেন।

'লুণ্ঠন'-এর মতো গল্প প্রেমচন্দের মতো লেখকের হাতে পড়লে কই মাছের ঝাল আর খেলনার বাঁদর ভাঙার উপসর্গগুলি হয়তো বা অনুক্ত থাকত। তাতে রসপ্রত্যাশী পরিশীলিত পাঠক একটু ক্ষুণ্ণ হলেও পাট চাষির বিড়ম্বনা অনেক বেশি নিরাড়ম্বর সত্যকথনের স্পষ্টতা পেত। পাটকল বন্ধ হলে হাটে পাটের দাম পায় না চাষি। ফলে অমেত্তো আর মনোরঞ্জন দুই শালাজকেই তাদের বউদের কাছে দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে হয়। এমন নিটোল বাঁধুনির গল্পটি বন্ধ পাটকলের মজুর আর পাটচাষির অসহায় অবস্থানকে বাঙলা ছোটোগল্পের রাজ্যে এক স্থায়ী আসন দিতে পারে।

নারীর আত্ম-অধিকার নিয়ে আন্দোলন আর গবেষণা দিকে-দিকে। সাধনবাবুর "মা" গল্পে বিয়ের বাইশ দিন বাদে বসুমতীকে বাপের ঘরে ফিরে আসতে হয়। বাপ গিরিশ রিকশা চালায়। বসুমতীর সমস্যা বুঝেও বলে তাকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতেই হবে। মা চিনিবালা মেয়েকে বোঝে। সে শ্বশুরবাড়ি ফিরতে দেবে না মেয়েকে। কাজ খুঁজে দেয় তাকে। সোয়ামির সামনে সহসা সে মুখ তুলে কথা কয় না। কিন্তু যখন সে ঘোষণা করে ও অর্থাৎ বসুমতী 'কাজ করবে'। তখন 'যেন হাজার হাজার মায়ের চোখ ও

কণ্ঠের সামনে গিরিশ জামাইদের একজন হয়ে গেছে।' কোনো পণ্ডিতী গবেষণায় চিনিবালা আর বসুমতীর আত্ম-অধিকারের লড়াই এমনভাবে ধরা পড়ে না। দশটি গল্পের মধ্যে চারটি গল্পের উল্লেখ করা গেল। হয়তো বাকি ছটির সবকটিই একই মানের নয়। তা হোক, সাধন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘজীবী হোন। তিনি যেন তাঁর গল্পের ধারা থেকে বিচ্যুত না হন।

সাধনবাবু যাদের নিয়ে গল্প লিখেছেন সৌমেন সেনের গল্পের কুশীলবে তারা অনুপস্থিত। এখানে আরও নাগরিক, আরও মধ্যবিত্ত জীবনের মনের ছবি। অর্থাৎ গল্পের উপাদানের অভাব নেই আমাদের পারিপার্শ্বিকে। সৌমেনবাবুর চরিত্রগুলি পতিতও নয়, আবার সবকটি নেপথ্যও নয়। যেহেতু এরা অন্নসংস্থানের সমস্যা নিয়ে তেমন জেরবার নয়, তাই এদের মনের ভাবনা বা অলস কৌতূহল অনেক বেশি উচ্চকিত। এবং এই ভাবনার আকাশটাও ভিন্ন ধরনের। যদিও এদের অনাত্মীয় বলে দূরে ঠেলে রাখতে পারবে না একালের অধিকাংশ পাঠক।

নতুন-কেনা মোটরবাইকে পাহাড়ি রাস্তায় রণজয় মিত্রের সামনে জবাইয়ের গোরুর ('গরু' বানানটা এতদিনে নির্বাসন পেল না দেখে একটু অস্বস্তি লেগেছে) পাল দেখে স্বভাবতই অলস কৌতূহল জাগে। তাই প্রশ্ন 'ক্যায়া ভাইয়া, কাঁহা যাওগে ?' একটু অলস কৌতূহল, একটু অনাবশ্যক আলাপ জমানোর তাগিদে, একটু সময় কাটানোর মজা। কিন্তু লোকটা জবাব দিল না। অর্থাৎ এই পাহাড়ি পথে হাতে মশালের মতো লম্বা কুপি আর কাঠির মতো লাঠি নিয়ে পাগড়ি মাথায় লোকটা রণজয়ের অপরিচিতই থেকে যায় এবং আমাদেরও। ক্রমে রণজয়ের জেদ চেপে যায়। হাঁটতে লাগল পাশাপাশি ···দু-একটা গোরুর গায়ে হাত বুলোচ্ছে···লোকটা কী ভাবছে এই কথাটা জানতেই তো তার এই পদযাত্রা। লোকটা হাসল, কিন্তু বলল না কিছুই। লোকটা কি তাহলে কিচ্ছু ভাবে না ? রণজয় বারে-বারে এমন এক-একজনকে প্রশ্ন করছে, 'কাঁহা যাওগে ভাইয়া।' কেউ হাসছে, কেউ এগিয়ে শিশ দিচ্ছে, গান ধরছে, জবাব দিচ্ছে না কেউ। রোখ চেপে যাচ্ছে রণজয়ের। আবার। এবারে খ্যাসখেসে গলায় লোকটা থেঁকিয়ে উঠল, 'তুমারা ক্যায়া ?' লোকটা এগিয়ে গেল। রণজয় দাঁড়িয়ে। দুজনের দুস্তর ব্যবধান দূর হল না। গল্প অগত্যা শেষ হল। এও এ সমাজের এক খবর, এক সত্য। সৌমেন সেনের অনেক গল্পেই এই ব্যবধানরেখাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। "প্রতিবিম্ব"-র মনোমোহন এবং লেখকের মধ্যেও সেই ব্যবধান। মনোমোহন লেখকের বন্ধুদের মাঝে একজন-মাত্র এবং লেখক একটু গণ্যমান্য ব্যক্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনোমোহনের শান্ত গলায় একটা উচ্চারণ, 'প্রতিবাদ করতে পারো না।' লেখককে নিজের কাছে নিজেকে উলঙ্গ করে দেয়। এখানেও সেই ব্যবধান, সেই পরাজয়। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত জীবনের সাধারণ এবং উচ্চমার্গের মধ্যে সংঘর্ষ এবং তজ্জনিত উচ্চমার্গের আত্মদর্শন—যেন লেখকেরই আত্মদর্শন। অন্য স্বাদের গল্পও আছে। বিয়ে-না-হওয়া মেয়ের বয়সের যন্ত্রণা এবং এ-জাতের মেয়েরা যে প্রেমের সংসারে চিরকালই নেপথ্য চরিত্র, তা মলাটের মাঝে নামাঙ্কিত গল্পে খুব বিশ্বস্তভাবেই বলতে পেরেছেন সৌমেনবাবু। প্রায় একই অনুভূতির ভিন্ন আখ্যান আছে আরেকটি গল্পে—নাম "চৈত্র বসন্ত"। তবে সাধনবাবুর "মা" গল্পের চিনিবালা আর বসুমতী এবং সৌমেনবাবুর "নেপথ্য চরিত্র" আর "চৈত্র বসন্ত"-র সমস্যা সমাজের দুই স্তরের নারীর সমস্যা। বিয়ের পর নিম্নবিত্তের আর বিয়ে-না-হওয়ায় মধ্যবিত্তের সমস্যা। সৌমেনবাবু ভাষারচনায় একটু সতর্ক, একটু রোমানটিক, হয়তো একটু-বা আধুনিক। তাতে গল্পের বিষয় মার খায় নি, বরং জায়গায়-জায়গায় উজ্জ্বলই হয়েছে। সৌমেন সেনের ক্ষেত্র নরনারীর যৌবন এবং তারই আধারে তিনি পারিপার্শ্বিক সমাজকে দেখতে

চেষ্টা করেছেন। এবং পেরেওছেন।

'ঋত্বিক ঘটকের গল্প'-কে দেখতে হবে একটু অন্য দৃষ্টি-কোণ থেকে। প্রথমেই সহস্র সাধুবাদ দিতে হবে ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে এমন একটি প্রায় নিখুঁত লোভনীয় প্রকাশনের জন্য। ছাপার সৌকর্য, ছাপার কাগজের মান এবং তৎসহ ঋত্বিক ছাড়া চোদ্দজন খ্যাতনামা শিল্পীর ছবি—এ বইকে সংগ্রাহকের সংগ্রহে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। ছবিগুলি কিন্তু ইলাসট্রেশন নয়, গল্প থেকে শিল্পীদের নিজস্ব ছবি—যে শিল্পীদের মধ্যে রামকিঙ্কর বেজ, কমলকুমার মজুমদার, সোমনাথ হোড়, চিত্তপ্রসাদ, কে জি সুব্রমনিয়ম, গণেশ পাইন আছেন। এমন ছবি দিয়ে (ইলাস্ট্রেশন নয়) বই প্রকাশের রেওয়াজ যদি এদেশে অনুসৃত হয় তাহলে যে-পাঠক বই কেনার ব্যাপারে একটু শৌখিন তাঁরা খুবই খুশি হবেন। তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে চোদ্দ/পনেরোটি ছবি (তার মধ্যে বেশ কয়েকটি রঙিন), একটি হাফটোন ফোটোগ্রাফ, সুদৃশ্য ধুলো-ঠেকানো আচ্ছাদ-মলাট, কাপড়ের বাঁধাই, পুরু কাগজ দিয়ে ১৩০ পৃষ্ঠার বই কীভাবে ৩০ টাকা দামে দিতে পারা গেল তা বিস্ময়ের ব্যাপার, যেখানে সৌমেন সেনের ১২০ পৃষ্ঠার সাদা-মাটা বই সরকারের অর্থানুকূল্যেও ১২ টাকা দামে বিক্রি করা হচ্ছে। এর পরেও কথা আছে। "ঋত্বিক ঘটকের গল্প"-এ একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান ভূমিকা লিখে, দিয়েছেন শ্রীগোপাল হালদার। গোপালবাবুর আশ্চর্য ভূমিকাটি ঋত্বিক-পরিচিতির এক স্মরণীয় লেখ। গল্পলেখক ঋত্বিককে নিয়ে বিশদ আলোচনার এক পরম সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে এ সংকলনটি। যদিও এক পৃষ্ঠার রচনাগুলিকে গল্পের মর্যাদা দেওয়া হবে কিনা বিচার্য। এগুলি ঠিক বনফুলের রচনার সমগোত্রীয়ও নয়। পুত্র ঋতবান বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার একটা ধারা বেশ বলিষ্ঠ তার অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। ঋত্বিক ঘটকের গল্প এই সমাজ-বাস্তবতাকে সাহিত্যে প্রকাশের জন্য কোনো দিশারি ভূমিকা যদি পালন করতে পারে', তবেই তাঁদের পরিশ্রম সার্থক হবে আশা করেছেন। ভূমিকায় গোপালবাবুও বলেছেন, 'চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যখন বাঙালি জীবনের মূল্যমান, পিতার স্নেহ, মাতার মমতা, সংসারের সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধন—বলি হচ্ছিল' 'অনেকদিন পরে আজ ঋত্বিকের গল্প হাতে পেয়ে··· মনে পড়ল সে কাল, সে উদ্যম উদ্যোগ আমার ছিয়াশি বৎসরের চোখে আজ ঝাপসা, আর মনে পড়ল সে ঋত্বিককে যে সেকালকে হারিয়ে যেতে দেয় নি, ধরে রাখতে চেয়েছে। এই গল্পগুলি তারই সাক্ষ্য।' ঋত্বিকের গল্প একজন চলচ্চিত্রকারের অবসরবিনোদনের স্বাক্ষর বহন করে না, বাঙলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে ঋত্বিককে ভুলে গেলে নেহাতই অন্যায় করা হবে। আলোচিত তিনটি গল্পসংকলনে আরেকবার বলার সুযোগ হল যোগ্য লেখকের অভাবে নয়, আগ্রহী প্রকাশকের অভাবেই বাঙলা ছোটোগল্পের পাঠক বঞ্চিত হচ্ছে। সে বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্‌যোগ নিয়েছেন যাঁরা তাঁদের বারে-বারে সাধুবাদ দিতেই হবে।

স্মরণে

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

মৃণাল নাথ

বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চায়, বিশেষত ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে, আমরা তিন ধরনের পণ্ডিতজনের সাক্ষাৎ পাই। এক-দলে আছেন যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক (সরকারি এবং/বা বেসরকারি) আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে ভাষাতাত্ত্বিকের শিরোপা পান, পুরস্কৃতও হন ; দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ তকমা-ধারী দীক্ষিত পুরুষ, কেউ কেউ নিজের উপস্থিতি প্রবলভাবে জাহির করতে ব্যস্ত ; কেউ কেউ স্বরাজ্যে সম্রাট হয়েও ক্ষীণকণ্ঠ বলে অশ্রুতই থেকে যান ; শেষ দলে পাই মুষ্টিমেয় কিছু অদীক্ষিত পণ্ডিতকে, যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক মোহ থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়ে নিরলসভাবে ভাষাচর্চা করে যান। সদ্যঃপ্রয়াত মণীন্দ্রকুমার এমনি একজন বিরলতম পণ্ডিত যাঁকে কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনোদিন লালিত করে নি, তাঁর বৈদগ্ধ্যের শিরোপা তিনি পেয়েছেন, যদিও অনেক দেরিতে, বিবুধমণ্ডলীর কাছ থেকে। আমরা অনেকেই তাঁকে জানতুম না যদি না "কৃত্তিবাস" পত্রিকা ১৯৭৬-৭৭ সালে এমন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে হাজির করাতেন। আমরা জানতে পারতুম না বাংলা ভাষা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, সেটি হয়তো "সাহিত্যের খবর"-এর মতো পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-শিক্ষক সমিতির বুলেটিন কিংবা "পর্ষদ বার্তা"র মতো খুবই সীমিত পাঠক-পৌঁছানো পত্রিকা। সে-সমস্ত প্রবন্ধের একাংশ যখন সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হল, 'সাময়িকী'-তে (১৯৭৭) কিংবা 'বাংলা বানান'-এ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬), তা দেখি অসামান্যতায় উজ্জ্বল। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রভা আমাদের মুগ্ধ করে, এ কারণে যে ভাষাতত্ত্বে প্রশিক্ষিত না হয়েও এমন গভীর মনন-সমৃদ্ধ ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ তিনি লিখতে পারেন বলে। এ আমাদের অসীম অজ্ঞতা যে আমরা তাঁকে চিনি নি আগে, তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিই নি এমন একটি পুরুষকে যিনি রবীন্দ্রনাথ, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার কিংবা রাজশেখর বসুর সঙ্গে বাংলা বানান, বর্ণসংস্কার, অভিধান বিষয়ক আলোচনা করে যাচ্ছেন এবং তাঁদের কাছে এই প্রচারবিমুখ পণ্ডিত, ভাষাতত্ত্বে অদীক্ষিত হয়েও এমন সব প্রশ্ন তুলেছেন যা এককথায় নাকচ করে দেওয়া উপরি-উক্ত পণ্ডিতদের পক্ষে কোনো সহজ ব্যাপার ছিল না। ১৯২২ সাল থেকে শুরু করে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বানান, বর্ণসংস্কার, ব্যাকরণ, ভাষায় শুদ্ধি-অশুদ্ধি, উপভাষা বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সংকলনগ্রন্থ-দুটিতে তার ভগ্নাংশ মাত্র গ্রথিত হয়েছে। তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তই যে তর্কাতীত, একথা হয়তো কেউ বলবেন না। ভাষাতত্ত্বের কূট-কচালিতে প্রবল আস্থাবানেরা তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করার চেষ্টাও করবেন, তবুও তিনি যে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে অবিসংবাদিতভাবে এক বিরাট পুরুষ—একজন মুকুটবিহীন সম্রাট একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তাঁর মতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই শুনতেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার, নিজের মতও বদলাতেন ভাষাচার্য—এমনি একজন বিদগ্ধ পুরুষ ছিলেন তিনি।

বর্তমান লেখকের কাছে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ দেখা দেন অন্য একটি মাত্রা নিয়ে। বস্তুত আমার কাছে মণীন্দ্রকুমারের সেটিই সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। প্রয়াত মণীন্দ্রকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বানান সমিতির বিধানসমূহ সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না—তিনি এসব বিধানে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ করেছেন। বানান সম্পর্কিত তাঁর প্রায় সব আলোচনাতেই এ-বিষয়ে পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন বানান সম্পর্কে, তেমনি বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও তাঁর দ্বিধা, সংশয় ছিল। (বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে তাঁর কোনো লেখা আমার নজরে আসে নি। অনুমান করি তিনি লিখেছেন।) বাংলা ভাষার এই তিনটি এলাকাতেই কোনো সুস্থিতি (stability) আজও আসে নি আর এমন কোনো সর্বজনগ্রাহ্য বা -মান্য প্রতিষ্ঠান এখনো নেই যার প্রচেষ্টায় একটি সুস্থিতি আমরা আনতে পারি। আমরা এখন যাকে 'মান্য বাংলা ভাষা' বলি এবং বেশ জোর করেই বলি, সেই ভাষা কিন্তু আজও মান্যায়িত (standardized) হয় নি বলেই বর্তমান লেখকের বিশ্বাস। বাংলা ভাষার মান্যায়ন-প্রয়াসে তাঁর এক অসাধারণ ভূমিকা ছিল। বাংলা বানান, বর্ণ, ব্যাকরণ, বাংলা প্রয়োগের কিছু অস্থির এলাকায় আমাদের তিনি নিয়ে গেছেন, যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা একেবারেই অবহিত ছিলুম না। সাম্প্রতিক কালে সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষাশোধন (language correction) বলে একটি মডেলের কথা আমাদের গোচরে এসেছে। সেই কাঠামোর প্রথম কথা ভাষার সমস্যার উন্মোচন (decoding of a problem)। তার পরবর্তী ধাপ হল সমস্যার দূরীকরণের জন্য রূপরেখা বানানো (a design for its removal) এবং তাকে কার্যে পরিণত করা (implementation of the design)। বাংলা ভাষার শোধনাত্মক প্রক্রিয়ার একক প্রবক্তা হিসেবে কিন্তু আমরা তাঁকে দেখতে পাই। তাঁর বাংলা ভাষা বিষয়ক লেখার মাধ্যমে প্রথম দুটি ধাপের কথা তিনি আমাদের জানিয়ে গেছেন। তৃতীয় পদক্ষেপটি সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে সমন্বিতভাবে। তিনি বেশ কিছু ব্যাকরণ বই লিখেছেন, বিদ্যালয়ে objective-type-test-এর প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, এ সবকে ছাপিয়ে তিনি আমার কাছে অনেক মহৎ হয়ে দেখা দেন, আরো বিরাট হয়ে দেখা দেন, একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে।

বাংলা ভাষার সেবক, ভাষা-পরিচর্যা তথা শোধনাত্মক প্রক্রিয়ার একক প্রয়াসী, বিরল পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই মনীষীর প্রয়াণে আমাদের যে ক্ষতি হল তা পূর্ণ হবার নয়। এই শতাব্দীর চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড়ো মহীরূহ-পুরুষ সহসাই কালের কাছে সমর্পণ করলেন নিজেকে ১৬ অগস্ট ১৯৮৯ দুপুরে।

ড. সুধীর সেন

সদ্যঃপ্রয়াত সুধীর সেন ছিলেন ছন্দঃশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সেনের অনুজ। তিনি সম্প্রতি নিউইয়র্কে তাঁর নিজের বাসস্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মী। ড. সুধীর সেনের জন্ম অবিভক্ত বাঙলার কুমিল্লা শহরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি। তিনি ছিলেন লনডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সের স্নাতক এবং অর্থনীতিশাস্ত্রে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেট। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠনের কাজে অর্থ নৈতিক উপদেষ্টার কাজ তিনি করেছিলেন। জওহরলালের সময় ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা সমিতিতেও তিনি

ছিলেন। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের তিনিই ছিলেন প্রথম সেক্রেটারি এবং চীফ এগজিকিউটিভ। ১৯৫৬ সালে তিনি নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে যোগ দিয়ে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশে ইউ. এন. ও.-র নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে বিশেষ সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। অবসর জীবনে তিনি ছিলেন নিউ-ইয়র্কের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর বেশিরভাগ রচনাবলী ইংরাজিতে লেখা। ইদানীং বাঙলাতেও তাঁর নানা-বিষয়ের লেখা "দেশ" এবং "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। তাঁর দুটি লেখা "বড়দার (প্রবোধচন্দ্র সেনের) দান…বাঙলা ছন্দ" এবং "কবি নজরুল প্রসঙ্গ" প্রকাশের অপেক্ষায় আমাদের দপ্তরে এখনও জমা আছে। যথাসময়ে দুটি নিবন্ধই চতুরঙ্গে প্রকাশিত হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই সুলিখিত নিবন্ধ দুটি ছাপা অবস্থায় দেখে যাওয়ার সুযোগ তাঁর হল না।

মতামত

১

"বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে একটি জীবন মানুষের রয়েছে"

চতুরঙ্গ জুলাই ১৯৮৯ সংখ্যায় গৌরী আইয়ুবের উপরোক্ত বিশ্লেষণ আমাকে চমৎকৃত করলেও এ প্রসঙ্গে স্বীয় মত ব্যক্ত না করে পারলাম না। তিনি আমার অতি শ্রদ্ধেয় এবং আইয়ুব ও তাঁর পায়ের কাছে বসে জীবনবোধের পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত করেছিলাম একসময়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর দরদি তৎপরতার জন্যে ও বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বচ্ছ অনুভূতির জন্য সচেতন মুসলমান বাঙালিরা তাঁর কাছে অবনত থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস।

রুশদী বিষয়ে আমাদের এ অঞ্চলে কোনোপ্রকার দন্তস্ফুট করা সম্ভব নয়, হয়তো বা কারো এজন্যে দন্ত-উদ্গমও কোনদিন হবে না। কেবল ও অঞ্চল থেকে যা পাওয়া যায় তারই চর্বন সম্বল। আমার প্রশ্ন রুশদীকে নিয়ে নয়, গৌরীদিকে নিয়ে। যখন তিনি বলেন, 'রুশদীর নিন্দা কোনো মুসলমানের মুখে শুনলেই অন্যপক্ষ নিশ্চিত হচ্ছেন, ইনিও তাহলে আর সব মুসলমানের মতোই সাম্প্রদায়িক, সম্ভবত মৌলবাদের সমর্থক। আবার যখনই কোনো হিন্দু রুশদীর সমর্থনে মুখ খুলছেন অমনি তাঁর সম্বন্ধে অপর পক্ষের ধারণা জন্মাচ্ছে ইনিও তাহলে সব হিন্দুর মতোই মুসলমানের হেনস্থায় খুশি হন·· তাদের দিকটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখবার মন নেই'—তখন অনুভব করছি হৃদয়তলের বেদনাবোধকে তিনি কতখানি ধরে রেখেছেন! তবে কাদের পক্ষ নিয়ে গৌরীদি এই সহানুভূতিপ্রবণ বিশ্লেষণ করেছেন? আমার প্রশ্ন হচ্ছে গৌরীদি···তাদেরকে মুসলমানদের ভেতর উদারচিত্ত ও পরমতসহিষ্ণু বলে খোঁজ করছেন, নাকি তাঁর মতো 'ইসলামের বাণীবাহকের যে ধরনের সমালোচনা আছে (রুশদীকে) তার ভাষা ও ভঙ্গির ইতরতা আমার পক্ষেও পীড়াদায়ক ঠেকেছে, যদিও আমি নাস্তিক মানুষ।'—তাঁদের কথা বলছেন?

ব্যক্তিগতভাবে আমি দীর্ঘদিন এই নাস্তিকতা নিয়ে নিজেকে অস্থির করেছিলাম। সমাজবিকাশের ধারা সম্বন্ধে ধর্ম যে একটি সাময়িক অথবা সময়-উপযোগী একটি বিধান, সে কথা যে একজন ধার্মিকও বুঝতে পারে একথা ভাবতে ভাবতে নানা বিষয়ে পড়তে-পড়তে বুঝতে পারলাম নাস্তিক হওয়ার অর্থ নেই, আস্তিক হওয়ার অর্থও যেমন। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নাস্তিকতাও একটি বিশ্বাস এবং একটি ধর্ম। ভগবান আছেন এই বিশ্বাস যদি আস্তিকতা, ভগবান নেই এই বিশ্বাসও তেমনি নাস্তিকতা। মূলতঃ দুটোই একটা বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

'বিধর্মীদের ধর্মপথে আসতে লাগে এক নিমেষ / সন্দেহেরই বিপথ-ফেরত বিবেক জাগে এক নিমেষ।

দুর্লভ এই নিমেষটুকু ভোগ করে নাও প্রাণভরে / এই ক্ষণিকের আয়েশ দিয়ে জীবন ভাসে এ নিমেষ' —নজরুল

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে একটি জীবন মানুষের রয়েছে, হোক তা বৈয়ামের মতো মাত্র এক 'নফসের' (ক্ষণিকের) জন্যে, সেই এক 'নফসের' জীবনই প্রকৃত মূল্যবান। শাস্ত্রে যাকে বলে অমৃত আস্বাদনের সময়।

আমার পক্ষে মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করেও মৌলবাদী বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, আবার গৌরীদির মতো নাস্তিকতায় বিশ্বাসী হওয়া যাচ্ছে না; এর মাঝখানের সেই 'নফসের' জীবনে আমার অবস্থান। আমি তথাকথিত বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী না হয়েও এই মুসলমান সমাজকে ভালোবাসি; আমার সমর্থন তাদের প্রতি শর্তহীন। তাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি না। তাদের শাস্ত্র কোরানটা হয়তো-বা রুশদীর কথায় শয়তানের উক্তি হতে পারে, কিন্তু সেই শাস্ত্রের ওপর আঘাত এলে আঘাতটা আমার বুকে লাগে। আসলে মুসলমান ধর্মটা আমার মায়ের মতো। অশিক্ষিত, বুদ্ধি নেই, সংস্কৃতি নেই, সংগীত নেই। কিছু নেই—তবু কেউ যদি আমার এই মাকে এই নিয়ে ব্যঙ্গ করে, এমনকি বোকা বলে, অমার্জিত বলে, বুকের ভেতর ব্যথাটা ঠিক তেমনি লাগে। সুতরাং এ-নিয়ে কী করা আপোস করা চলে বুঝতে পারি না। আমি ঈদের দিন জামাতে যাই। কোলাকুলি করি, সেমুই পায়েস খাই। গায়ে একটু সুগন্ধি আতর মাখি, যা অন্য কোনো সময় করি না। এই কাজটা করার সময় একবারও বিশ্বাস আছে কি বিশ্বাস নেই ভাবি না। হয়তো এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু এ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না।

পরিশেষে বলা দরকার, বিংশ শতাব্দীর শেষ-প্রান্তে যেখানে শান্তিবাদীরা ভেবেছিলেন ধর্ম মরে মনুষ্যত্ব বর্তাবে, সেখানে ঠিক উল্টোটা হচ্ছে। সে জন্য দায়ী কিন্তু 'Mohound' রচিত স্যাটানিক ভার্সেস নয়, ঐ মোনাফেক রচিত স্যাটানিক ভার্সেসই।

শামসুল আলম সাঈদ
চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ

২

"চোখ রাঙিয়ে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে সত্যিই কি কোন ভাবনাকে ঠেকানো যায়?"

জুলাই '৮৯ সংখ্যা চতুরঙ্গে গৌরী আইয়ুব লিখিত "রুশদী, খোমেইনি এবং এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি" প্রবন্ধটি আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। বর্তমান কালে এরূপ নিরপেক্ষ মানসিকতার অত্যন্ত অভাব। লেখিকা সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রবন্ধটি লিখেছেন। এই লেখার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য এবং লেখাটি প্রকাশ করায় আপনারা ধন্যবাদার্হ। আলোচ্য প্রবন্ধটি আমাদের চিন্তার উদ্রেক করে।

উক্ত প্রবন্ধে একাধিক শিক্ষণীয় সার্বজনীন বাক্য রয়েছে। আমি মাত্র তিনটি উদ্ধৃত করছি :

(১) কোন সংশোধনই সম্ভব নয় যখন তাতে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা যুক্ত না হয়—তা ব্যক্তিরই হোক, সমাজেরই হোক বা ধর্মেরই হোক।

(২) চোখ রাঙিয়ে, মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে সত্যিই কি কোনো ভাবনাকে ঠেকানো যায়?

(৩) কোনো মহৎ আদর্শেরই সত্যিকারের শক্তি পেশীতে নয়, পিস্তলে নয়—শক্তি থাকে তার উদার মানবিকতায়।

এসব কথা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার
জগাছা। হাওড়া

৩

'ধর্মান্ধদের মতোই অর্থনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা'

জুলাই ১৯৮৯-এর 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত "রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি" নিবন্ধটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এমন সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, বিশ্লেষণমূলক লেখা আমাকে অভিভূত করেছে। শ্রদ্ধেয় গৌরী আইয়ুবের কথা এখানে কিছু-কিছু শুনেছি এখানকার বামপন্থী নেতা শ্রীঅজয় রায়ের কাছে। কিন্তু এর আগে তাঁর কোনো লেখার সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তাঁর এই লেখাটি থেকে একজন স্থিতধী চিন্তাশীল মানুষের পরিচয় পেয়ে আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। এটি লেখার জন্য তাঁকে এবং এটি প্রকাশের জন্য সম্পাদককে আমি অকৃত্রিম সাধুবাদ জানাচ্ছি।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্কের যে বাধা বর্তমানেও দৃশ্যমান, তা এই ধর্ম। এ নিয়ে সারা দুনিয়ায় যত মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি হয়েছে, তা বোধ করি অন্য কোনো কিছু নিয়ে নয়; অথচ হয়তো এর অনেকটাই একেবারে অনর্থক হয়েছে। জমি দখলের জন্য লড়াইয়ের একটা বস্তুগত লাভালাভের কারণ বোঝা যায়, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোরও একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ধর্মের জন্য লড়াইয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া ভার। যদিও বস্তুবাদী দৃষ্টির শেষ ব্যাখ্যায় এর কারণ অর্থ নৈতিক—এবং তা মোটেই ভুল নয়। তবু বহু সাধারণ মানুষ যে এতে আত্মাহুতি দেয়, তাদের সামনে কিন্তু অনেক সময়েই কোনো ইহলৌকিক কারণ থাকে না, থাকে একটি ধর্মীয় উন্মাদনা—যে উন্মাদনায় সে জড়িত হয় একান্তভাবেই অলৌকিক কোনো কিছু প্রাপ্তির আশায়। কোনো বস্তুবাদীর কাছে অবশ্যই এর কোনো মানে নেই, কিন্তু কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছেই তা আছে কি! তার তো কাজ হল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আচার-আচরণ বিষয়সমূহ পালন করা। অথচ তা ছেড়ে যে গিয়ে হাজির হয় হত্যার মঞ্চে—নিজেও মরে, সম্ভব হলে অন্যকেও মারে। তবু এমন মৃত্যুর জন্য দুঃখ লাগে বই কি! মানুষের জীবন তো দুনিয়ায় আর দুবার আসে না।

ধর্মের প্রগতিশীল চরিত্রকে উপেক্ষা এবং এর প্রবক্তা আর অনুগামীদের কেবল দুষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করে আজকের দিনে ধর্মান্ধদের মতোই ফায়দা (অর্থনৈতিক) লোটার যে ব্যবস্থা রুশদী করেছেন, তা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। শ্রদ্ধেয় গৌরী আইয়ুব সমস্যাটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন।

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম
মুক্তধারা, ৭৪ ফকীরাপুল
ঢাকা-১১০০

৪

নাস্তিক প্রাবন্ধিককে ধন্যবাদ

"চতুরঙ্গ" পত্রিকায় পঞ্চাশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (জুলাই ১৯৮৯) গৌরী আইয়ুবের "রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি" শীর্ষক সারগর্ভ আলোচনাটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। প্রবন্ধটি যে-কোনো মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীকে মুগ্ধ করবে বলে আমার দৃঢ় প্রত্যয়। এও প্রতীতি জন্মে যে এদেশের বুদ্ধিজীবী মহল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের প্রবল আবেদন সম্বলিত, গবেষণাধর্মী, নির্মোহ এই আলোচনা থেকে বিমল আলোকের সন্ধান পাবেন। বহু বিতর্কিত ও আলোচিত "দ্য স্যাটানিক ভার্সেস"র লেখক সলমন রুশদী মুসলমানদের প্রিয় পয়গম্বর হজরত মুহম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে যে অশ্লীল অপরিশীলিত মন্তব্য করেছেন তা নাস্তিক প্রাবন্ধিক গৌরী আইয়ুবকেও পীড়িত করে। একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষঙ্গে লালিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মৌল বিশ্বাসের মর্মমূলে আঘাত করে রুশদী যে ইতরতার পরিচয় দিয়েছেন সেই ইতরতাকে আদৌ সমর্থন না করে গৌরী আইয়ুব সাহসের সাথে বলতে পেরেছেন: 'একথা বোধহয় বলা যায় যে এই কাজ করে কতখানি বিপদের ঝুঁকি তিনি নিচ্ছিলেন তা বোধহয় সম্পূর্ণ নিজেও বুঝতে পারেন নি।'

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শিল্পের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও শিল্পীর স্বেচ্ছাচারিতা অনুমোদনযোগ্য নয়। গৌরী আইয়ুব এই কঠিন সত্যেরই স্বরূপ অনুসন্ধান করেছেন তাঁর প্রবন্ধে।

মোঃ সানাউল্লাহ
কোচা, বর্ধমান

৫

দুনিয়ার বহু মনীষীর ইসলাম সম্পর্কে অভিমত প্রশংসাপূর্ণ

"চতুরঙ্গ" জুলাই ১৯৮৯ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবের "রুশদি, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি" লেখাটির জন্য ধন্যবাদ। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখিকা সমস্ত ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন দেখে আনন্দিত হলাম। লেখাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার নিরপেক্ষতার প্রকাশ লক্ষ করি।

তবে লেখিকার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পারলাম না। তাঁর ভাষায় 'খোমেইনির এই প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা এই সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে না গেলে মুসলমানদের বেদনাকে সম্ভবত সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করতেন হিন্দু সমাজ।' খোমেইনির এই 'ফরমানে'র বহু আগে যখন সবে ভারত সরকার বইটি নিষিদ্ধ করেছেন তখন প্রথম শ্রেণীর দৈনিক (তথা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক)-গুলি, সম্পাদকীয় কলম থেকে রম্যরচনা পর্যন্ত সব রচনাতেই বইটি 'অতীব উচ্চমানে'র, 'সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের গ্রন্থ' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন, এবং বইটির যে-কোনো সমালোচককে ধর্মান্ধ, সঙ্কীর্ণমনা প্রভৃতি আখ্যা দান করছিলেন ('এঁদের কলম থেকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও রেহাই পান নি)। এ সময় অসংখ্য মানুষ যাঁরা আদৌ সাহিত্যের ধারেকাছেও ঘেঁষেন না তাঁরাও 'সাহিত্য গেল', 'সাহিত্য গেল' বলে অশ্রুপাত করেছিলেন, শতকরা পাঁচজনও সেদিন বইটি নিন্দা করার মতো সৎ ও সত্যকার সাহস দেখান নি। কেবল 'মুক্ত চিন্তায় হস্তক্ষেপ', 'ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব', 'মহান সাহিত্য থেকে আমরা বঞ্চিত' ইত্যাদি গালভরা বুলিতে পাঠকের কলমগুলি ভরিয়ে তুলেছিলেন। মজার ব্যাপার, যাঁরা বইটির নিষিদ্ধকরণকে অর্থহীন, অবিবেচক সিদ্ধান্ত বলে চিহ্নিত করেছিলেন পরে তাঁদেরই অধিকাংশের মতপরিবর্তন হয়েছিল (যখন এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে হিংসাশ্রয়ী হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ছিল)। তাঁরা সিদ্ধান্তটিকে সময়োচিত ও সঠিক বলে মেনেছিলেন।

লক্ষণীয় যে, ইসলাম বা পয়গম্বর সম্বন্ধে যে-কোনো সমালোচনা বা নিন্দাপূর্ণ আলোচনাকে অমুসলিম সমাজ খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে। কোনো বিশিষ্ট মানুষ, ব্যক্তিত্ব ইসলামের সামান্যতম সমালোচনা করলেও অনেকে আনন্দিত হন। কিন্তু অনেক মনীষী, অনেক খ্যাতনামা মানুষ কোরান, পয়গম্বর তথা ইসলামের সম্বন্ধে যেসব শ্রদ্ধাপূর্ণ কথা বলে গেছেন তা তাঁর একবারও মনে আসে না, সযত্নে এড়িয়ে যান। এইচ. জি. ওয়েলস, আর্নল্ড টয়েনবী, বা সলমন রুশদি কী বলছেন, তা নিয়ে আমাদের আগ্রহের শেষ নাই, অথচ কোরান বা ইসলাম সম্পর্কে স্ট্যানলি লেনপুল, সরোজিনী নাইডু, জন ডিভনপোর্ট, মহাত্মা গান্ধী, বসওয়ার্থ স্মিথ প্রভৃতি অসংখ্য মনীষীর অভিমত বা বার্নাড শ, গিবন, গ্যেটে, কার্লাইল, ড্রপার, এডমনড বার্ক প্রভৃতির বিখ্যাত উক্তিগুলির খবর অনেকেই রাখি না, রাখলেও দ্বিতীয়বার আমাদের মুখ থেকে পুনরাবৃত্ত হয় না। এটা সত্যিই দুঃখের! বিস্ময়েরও বটে।

রুশদির ইসলামী পড়াশোনার ব্যাপারে বলা যায় শ্রদ্ধাবিযুক্তভাবে পড়লে (কারণ নিজের মুখরোচক বইয়ের মাল-মশলাটুকু সংগ্রহ করা ছাড়া তাঁর অন্য দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই ছিল না) যে-কোনো সুন্দর গ্রন্থও কণ্টকাকীর্ণ মনে হবে। অস্বচ্ছ ও বিকৃত দৃষ্টিই সুন্দরকে অসুন্দর করে দেখায়।

যাই হোক, রুশদি-খোমেইনি বিতর্কে অন্য পত্র-পত্রিকাগুলি যখন একপেশেভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করছে বা করেছিল তখন মাত্র কয়েকটি পত্রিকা যথার্থ নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রেই এদের শ্রদ্ধা জানাবে।

এম. তনবীর
শিউড়ী, বীরভূম

৬

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রসঙ্গ

চতুরঙ্গের ৫০ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে মতামত রাখতে গিয়ে ৫০ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় কয়েকটা তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রী তরুণ পাইন। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু মূল্যায়ন। আমরা তাঁর এই ওয়ালীউল্লাহ্ নিষ্ঠায় বেশ চমৎকৃত হয়েছি।

শ্রী পাইন যথার্থই উল্লেখ করেছেন "উজানে মৃত্যু" সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত "সমকাল" পত্রিকার ১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এটি অগ্রন্থিতই থেকেছে। জনাব হোসেন সম্পাদিত প্রাগুক্ত রচনাবলীতেই (দ্বিতীয় খণ্ড) এই তথ্য উল্লিখিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৫৮৮)।

কিন্তু '"বহিপীর"-এর প্রকৃত প্রকাশসাল নিয়ে অন্য এক জটিলতার সৃষ্টি হয়' বলে তিনি যে-মন্তব্য করেছেন সেই মন্তব্য সঠিক নয়। শ্রী পাইন সম্পাদক কর্তৃক সন্নিবেশিত তথ্য সতর্ক হয়ে অনুসরণ করলেই বুঝতে পারতেন, এর প্রকাশসাল নিয়ে কোনো জটিলতা নেই। সম্পাদক স্পষ্টতই বলেছেন বহিপীর ১৯৫৫ সালে P.E.N পুরস্কার পেয়েছিল এবং সেটা প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। P. E. N. পুরস্কার দিয়েছিল পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে, গ্রন্থের জন্য নয়। সম্পাদক এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন : '১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পি. ই. এন. ক্লাবের উদ্যোগে ঢাকায় যে-আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন হয়, সে উপলক্ষে বাংলা নাটক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বহিপীর দ্বিতীয় স্থান লাভ করে এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন-এর সম্পাদনায় নাটক তিনটি "মা-বহিপীর-আবর্ত" নামে ১৯৬০ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮২)। ১৯৫৫ সালে গ্রন্থাকারে বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সম্পাদক সে তথ্য নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন, ১৯৬০ সালে "প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়" এই তথ্য সন্নিবেশিত থাকত না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'মৃত্যুসাল' সৈয়দ আকরম হোসেন 'ভুল দিয়েছেন' বলে যে অভিযোগ শ্রী পাইন তুলেছেন, তা ও বিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য বলে মনে হয় নি। শ্রী পাইন অভিনিবিষ্ট পাঠক হলেই লক্ষ করতেন যে, সঠিক তথ্য সম্পাদক কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রসঙ্গ'—এই অংশে। সম্পাদক লিখেছেন: 'কিন্তু দেশবাসীর চূড়ান্ত সাফল্য, পাকিস্তানী শাসনমুক্ত বাংলাদেশ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। প্যারিসের উপকণ্ঠে তাঁর নিজস্ব ফ্লাটে কর্মরত অবস্থায় ১০ই অক্টোবর ১৯৭১-এর মধ্যরাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯১)। সুতরাং এরই মাত্র তিন পৃষ্ঠা পর যখন মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ প্রসঙ্গে '১৯৭০' মুদ্রিত থাকে, তখন সেটা মুদ্রণপ্রমাদ বলে ধরে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না। বিশেষত মৃত্যুর তারিখ উল্লেখের আগে, '২৬শে মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্যারিসে অবস্থান করে স্বাধীনতার পক্ষে (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্) অংশগ্রহণ করতে থাকেন,' এই বাক্যটিই বুঝিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট যে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি কত সালে ঘটেছিল। কী এপার বাংলা, কী ওপার বাংলা, বাঙালি মাত্রেরই জানা আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালে, ১৯৭০ সালে নয়। এ প্রসঙ্গে শ্রী পাইনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আরো উল্লেখ করি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত জীবনীপঞ্জিতে এই মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫৯৫)। তবু শ্রী পাইনের আন্তরিকতার সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাঠ এবং তাঁর জিজ্ঞাসু মনের পরিচয় পেয়ে বাংলাদেশী হিসেবে আমরা আনন্দিত হয়েছি। তাঁকে ধন্যবাদ।

মাসুদুজ্জামান

২২৯ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ডাকঘর নিউমার্কেট, ঢাকা

সংসদ প্রকাশিত

ধ্রুপদী রচনাবলী

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত
- **বঙ্কিম রচনাবলী** ১ম (১৪টি উপন্যাস) ৪০·০০
- **বঙ্কিম রচনাবলী** ২য় (প্রবন্ধ ও সাহিত্য) (সমগ্র রচনা ২ খণ্ডে) ৫০·০০
- **রমেশ রচনাবলী** (৬টি উপন্যাস) ৪০·০০

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত
- **মধুসূদন রচনাবলী** (সমগ্র) ৩৭·৫০
- **দীনবন্ধু রচনাবলী** (সমগ্র) ৪০·০০

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত
- **গিরিশ রচনাবলী** ১ম ২৫·০০
- **দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী** ২য় ৫০·০০
- **দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী** (সমগ্র রচনা ২ খণ্ডে) ৬০·০০

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
- **গিরিশ রচনাবলী** ২য় ৪৫·০০
- **গিরিশ রচনাবলী** ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম (যন্ত্রস্থ)

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
- **তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ** (তিন খণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প) প্রতি খণ্ড ৫০·০০

ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত
- **সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ** ১০০·০০ (সমগ্র কাব্যাংশ এক খণ্ডে)

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত
- **বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র** ২৫·০০ (সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ)

সাহিত্য-সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
- **বৈষ্ণব পদাবলী** ৭৫·০০
- **রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত** ৪০·০০

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত
- **তন্ত্রের কথা** ১০·০০
- **উপনিষদের কথা** ১০·০০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত
- **ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য** ৪৫·৫০

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
- **উপনিষদের দর্শন** ২০·০০
- **ঠাকুরবাড়ীর কথা** ২৫·০০
- **The Challenge to India** ৪৫·০০

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত
- **তে হি নো দিবসাঃ** ৪০·০০
- **Keats : From Theory to Poetry** ৩০·০০
- **Swami Vivekananda and Indian Nationalism** ৪৫·০০
- **India Wrests Freedom** ৭০·০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী রচিত
- **রাজনীতি** ১৫·০০

বৈদ্যনাথ ঘোষ রচিত
- **কল্পান্ত** ২০·০০

ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত
- **রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি** ২৫·০০

(সাহিত্য যেখানে মর্যাদায় গৃহীত)

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ • ফোন : ৩৫ : ৭৬৬৯ ও ৩৫ : ৩১৯৫